# আমার ছেলেবেলা

বুদ্ধদেব বসু

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৬০

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। মুদ্রক : পরানচন্দ্র রায়, সনেট প্রিন্টিং ওআর্কস, ১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা ৬।

# আমার ছেলেবেলা

## সংশোধন

এই বইয়ে কযেকটি ছাপার ভুল ঘ'টে গেছে, এখানে সেগুলি উল্লিখিত হ'লো :

| পৃষ্ঠা | পঙক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ১৩ | ৪ | 'A bullock-carti !' | 'A bullock cart !' |
| ৭০ | ১৮ | আমাব | আমার |
| ৭১ | ১৩ | তারা | তাঁরা |
| ৮৮ | ১৯ | গভীরবুদ্ধির | গভীর বুদ্ধির |
| " | ২২ | ব্যাবধানের | ব্যবধানের |
| ১১৬ | ৩ | পূর্ণিমার | পূর্ণিমার |

আমার ছেলেবেলার কথা আগে অনেকবার লিখেছি। 'সাড়া' উপন্যাসের প্রথম অংশে, 'আমার বন্ধু' ও 'অন্য কোনখানে' উপন্যাসে, 'পুরানা পল্টন', 'নোয়াখালি', 'চার্লস চ্যাপলিন', ও 'রামায়ণ' প্রবন্ধে, কোনো-কোনো ছোটো গল্পে ও কবিতায়, তাছাড়া কয়েকটা উপলক্ষমূলক ক্ষুদ্র রচনাতেও সেই ইতিবৃত্ত টুকরো-টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে আছে। কল্পনায় বা অন্য বিষয়ে আশ্রিত হ'লেও সেই ভগ্নাংশগুলিতে আত্মজৈবনিক যাথার্থ্য নেই বলা যায় না। তবু যাকে বলে 'নিছক তথ্য' তারও প্রয়োজন ঘটে মাঝে-মাঝে, তথ্যান্বেষীর কৌতূহল থেকে কবিরাও আজকাল নিস্তার পান না, আর আমিও যথাস্থানে তথ্যের মূল্য স্বীকার ক'রে থাকি। সেইজন্যেই এই লেখাটার অবতারণা।

একটা কথা বলা দরকার। পূর্বোক্ত রচনাগুলির কোনো-কোনো বিষয় এই লেখাটাতেও ব্যবহার করতে বাধ্য হবো। সে-সব যাঁদের পড়া আছে, তাঁদের কাছে এই পুনরুক্তির জন্য মার্জনা চেয়ে রাখছি।

# ১

আমি জন্মেছিলাম কুমিল্লায়, আমার দাদামশায়ের তৎকালীন কর্মস্থলে, বঙ্গাব্দ ১৩১৫, ১৫ অগ্রহায়ণ, খৃষ্টাব্দ ১৯০৮, ৩০ নভেম্বর তারিখে। পিতার নাম ভূদেবচন্দ্র বসু, মাতা বিনয়কুমারী—কন্যাবস্থায় তাঁর পদবি ছিলো সিংহ। 'বিনয়কুমারী' নামটি আমি কারো মুখে উচ্চারিত হ'তে শুনিনি, 'মুকুল' পত্রিকার একটি পুরোনো খণ্ডে কাঁচা হস্তাক্ষরে লেখা দেখেছিলাম—কেমন ক'রে সেটিকে আমার মায়ের নাম ব'লে শনাক্ত করেছিলাম তা আমার মনে নেই। আমি বিনয়কুমারীর প্রথম ও শেষ সন্তান—আমার জন্মের পরে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই প্রসবোত্তর ধনুষ্টংকার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুই আমার নামকরণের কারণ।

আমার জন্মের ও তাঁর মৃত্যুর সময় বিনয়কুমারীর বয়স ছিলো ষোলো—আমাদের এ-কালের হিশেবে তিনি তখনও বালিকা। তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার একমাত্র সন্তান এবং ভূদেবচন্দ্র পত্নীকে হারিয়ে বছরখানেকের জন্য পরিব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। এই দুই কারণে আমি আমার মাতামহ-মাতামহীর ঘরেই মানুষ হয়েছিলাম—কার্যত তাঁরাই ছিলেন আমার পিতামাতা।

তাঁদের নাম চিন্তাহরণ সিংহ ও স্বর্ণলতা (পৈতৃক পদবি ঘোষ)। চিন্তাহরণ ছিলেন বোধহয় এফ. এ.-পাশ বা বি. এ.-ফেল-করা মানুষ; প্রথম বয়সে স্কুলমাষ্টারি করতেন, পরে পুলিশ-বিভাগে কর্ম নেন। পুলিশে ঢোকার পর তিনি দু-একটা

অনুচিত ব্যসনে মেতেছিলেন, উৎকাচগ্রহণেও তাঁর দ্বিধা ছিলো না—এ-সব কথা আমাদের পারিবারিক মহলে ঘূর্ণিত হ'তো মাঝে-মাঝে। আর সেই সঙ্গে এ-কথাটাও অনেকবার আমার কানে এসেছে যে তাঁর কন্যার মৃত্যুর পরে সব কদভ্যাস তিনি পরিত্যাগ করেন; আমি তাঁকে যখন দেখেছি তখন তিনি নিতান্তই গৃহপালিত জীব। নিশ্চিন্তে বলা যায় পুলিশের চাকুরে হবার মতো কোনো যোগ্যতাই তাঁর ছিলো না—অত্যন্ত ভীরু ও শঙ্কাপরায়ণ মানুষ তিনি, দেহ তেমন বলিষ্ঠ নয়; মাসের মধ্যে যেদিন তাঁকে রাত্তিরে 'রাউণ্ড' দেবার কাজে বেরোতে হয় সেদিন সন্ধে নামলেই তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়; রাস্তায় বেরিয়ে দূর থেকেও কোনো ঊর্ধ্বতন রাজপুরুষকে দেখলে তিনি যেন অজানা ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে পালাবার পথ খুঁজে পান না; কোনো কল্পিত বিপদেও অত্যন্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়েন। সন্দেহ নেই, কর্তৃপক্ষও তাঁকে অযোগ্য ব'লেই জানতেন, কেননা তাঁর বয়স যখন প্রায় পঞ্চাশ, তখনও তিনি ক্ষুদ্র দারোগামাত্র, গরীয়ান ইন্সপেক্টর-পদে উন্নীত হ'তে পারেননি।

স্বামী-স্ত্রীতে স্বভাবের মিল ছিলো না। স্বর্ণলতা ছিলেন স্বাস্থ্যবতী ও প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী; ঘরোয়া পার্লামেন্টের বৈঠকে তিনি যেমন তীক্ষ্ণভাষিণী হ'তে পারতেন, তেমনি হাস্য-পরিহাসমুখর পারিবারিক আড্ডা জমানোতেও তাঁর দক্ষতা ছিলো। চারদিকের আত্মীয়বর্গকে আকর্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার মতো ক্ষমতা তিনি ধারণ করতেন; পিতৃকুল ও শ্বশুর-

কুলের অনেকেই ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে আসতেন তাঁর কাছে, আসতেন ভারমুক্ত হ'তে গর্ভবতীরা—অনেক নবজাতক ও নবজামাতার পরিচর্যা তাঁকে করতে দেখেছি। তিনি স্কুলে কতদূর পড়েছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁর পোস্টমাষ্টার-পিতার গৃহে বাংলা লেখাপড়া ভালোই শিখেছিলেন মনে হয়; চিঠিপত্র বেশ গুছিয়ে লিখতেন, বাড়িতে ছিলো অনেককালের পুরোনো চামড়ায়-বাঁধাই বঙ্কিমের ভল্যুম, সন্ধেবেলা কখনো-কখনো মাসিকপত্র থেকে গল্প প'ড়ে শোনাতেন আমাদের—সেটা আমার খুব ভালো লাগতো, তাঁর কণ্ঠস্বর মন্দ্রিত ও উচ্চারণ স্পষ্ট ছিলো।

২

চিন্তাহরণ ও স্বর্ণলতা—এঁরাই আমার বাল্যজীবনকে পরিবৃত ক'রে রেখেছিলেন। বিশেষত আমার দাদামশায়ের সঙ্গে আমি এমন এক ধরনের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, যার বুনোনটা খুব ঘন, প্রায় কোথাও ফাঁক নেই—পিতাপুত্রের সম্বন্ধের চেয়ে অনেকটাই বড়ো তার আয়তন। কেননা তিনি ছিলেন আমার জীবনের প্রথম শিক্ষক, প্রথম বন্ধু, ও প্রথম ক্রীড়াসঙ্গী—চাকুরির সময়টুকু বাদ দিয়ে তিনি আমাকেই তাঁর জীবন উৎসর্গ ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে অল্প বয়সে স্কুলে ভর্তি করেননি—সেজন্যে আমি অন্তহীনভাবে কৃতজ্ঞ; যে-রকম যত্নে আমাকে তিনি ইংরেজি শিখিয়েছিলেন তার কোনো তুলনা হয় না। শীতের ভোরে বেড়াতে বেরিয়েছি

তাঁর সঙ্গে — আমার পরনে কান-ঢাকা টুপি আর আলস্টার — তিনি চলতে-চলতে জিগেস করছেন : 'Do you see what I see ?' আর আমি তাঁর চোখের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে ব'লে উঠছি, 'A tree !', 'A dog !', 'A bullock-cart !'— এমনি সারাটা সময়। রবিবার বিকেলে তাঁর সঙ্গে আমার খেলা জমে শব্দরচনা ও শব্দহরণের চৌকো এ বি সি ডি-গুলো নিয়ে — সেটাও ইংরেজি চর্চারই একটা উপায় ; তিনি ইচ্ছে ক'রে আমার কাছে হেরে গেলেন বুঝেও আমি খুশি না-হ'য়ে পারি না। পারিবারিক ছোটো-ছোটো চিঠিপত্র তিনি আমাকে দিয়েই লেখান ; আমার সাত বছরের জন্মদিন থেকে আমাকে একটি রোজনামচা লেখার কাজে লাগিয়ে দিলেন — সবই ইংরেজিতে। শুরুতে তিনি বাক্যগুলো ব'লে দিতেন আমাকে, বা সাহায্য করতেন : অল্পদিনের মধ্যে আমার কলম স্বাধীন-ভাবে সচল হ'য়ে উঠলো।

আমার ইংরেজির জন্য দাদামশাই যে এত বেশি যত্ন নিয়েছিলেন, তার কারণ কি তাঁর কলোনিয়েল মনোভাব ? হয়তো তা-ই — বাড়িতে দিল্লি-দরবারের মস্ত রঙিন ছবিও দেখেছি, রৌপ্যমুদ্রার উপরে অঙ্কিত মহারানীর মূর্তিটিকে মহিলারা বলতেন 'সাক্ষাৎ ভগবতী'। তবু বলবো যে এখনকার স্বাধীন ভারতের বিত্তশালী সমাজে যে-ইঙ্গোন্মাদনার জোয়ার ডেকেছে ( যেন ছেলেমেয়েরা ফিরিঙ্গি টানে এক ধরনের খিচুড়ি-ইংরেজি বলতে পারলেই শিক্ষার চূড়ান্ত হ'লো ! ), সে-রকম কিছুই আমার পরিবেশের মধ্যে ছিলো না তখন। ইংরেজি

ছিলো আমাদের কাছে বইয়ের ও স্কুল-কলেজের ভাষা— জীবনের ভাষা বাংলা। আমার বাংলার জন্য চিন্তাহরণকে কোনো শ্রম করতে হয়নি, আমার শিক্ষক ছিলেন শুধু লেখকরা—যোগীন্দ্রনাথ উপেন্দ্রকিশোর থেকে শুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জাদুকরগণ।

দাদামশাই আমাকে সংস্কৃতটাও ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর উৎসাহে আমি 'নরঃ নরৌ নরাঃ' ও 'তি তস্ অন্তি'র প্রথম সিঁড়িগুলো ভেঙেছিলাম, মুখস্থ করেছিলাম কিছু চাণক্যশ্লোক, কয়েক পৃষ্ঠা 'হিতোপদেশ' চর্বণ করেছিলাম। আরো দুটো সংস্কৃত কবিতা আমার কণ্ঠস্থ ছিলো, মনে পড়ে—একটার নাম 'মোহমুদ্গর', গভীর বৈরাগ্যবোধক সমিল একটি পদ্য, শঙ্করাচার্যের :রচনা ব'লে কথিত, প্রথম লাইন 'মূঢ় জহিহি ধনজনতৃষ্ণাম্' ;—বিষয়টা ঠিক শিশুর পক্ষে উপযোগী না-হ'লেও তার শব্দঝংকার আমার ভালো লেগেছিলো। অন্যটা এর ঠিক উল্টো পিঠের ব্যাপার, 'ধনং দেহি জনং দেহি' ধরনের চীৎকারসর্বস্ব এক সুদীর্ঘ দুর্গাস্তোত্র; আমার মুখে আবৃত্তি শুনে দাদামশাই খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু আমি তা থেকে কোনো আনন্দ পাইনি। এই পর্যন্ত—আমার ছেলেবেলার সংস্কৃত শিক্ষা ;:পরে স্কুলে-কলেজে—ব্যাকরণের প্রতি বিতৃষ্ণা নিয়েও—আমি আরো কয়েকটি পদক্ষেপ এগোতে পেরেছিলাম। একে বুড়ি-ছোঁয়ার বেশি কিছু বলা যায় না, কিন্তু এখন বুঝতে পারি ঐ স্বল্প তহবিলও আমার সাহিত্যিক জীবনে কাজে লেগেছিলো—এখনো লাগছে।

আমার ইংরেজি শিক্ষা বিষয়ে আর-একটা কথা বলতে চাই। দাদামশাই আমাকে ব্যাকরণের বালুডাঙায় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট করেননি, কোনো নেসফীল্ড ছুঁয়ে দেখতেও হয়নি আমাকে; কাকে বলে জেরাণ্ড বা ইনফিনিটিভ, ক্রিয়াপদের মধ্যে কোনগুলো ট্র্যানজ়িটিভ আর কোনগুলো নয়—এ-সব তত্ত্ব অনেক বয়স পর্যন্ত আমি জানতাম না। আর তাই ঐ বিদেশী ভাষা অতি সহজে তার আনন্দের উৎসটি আমার জন্য খুলে দিয়েছিলো। আমার বয়স যখন ছয় থেকে আটের মধ্যে সেই সময়েই আমি ইংরেজি কবিতায় স্পৃষ্ট ও দষ্ট হয়েছি; 'Break, break, break/On thy cold gray stones, O sea!—এই লাইনটার অফুরন্ত অনুরণন আমি শুনতে পাই মনে-মনে, তুষার-ঝড়ে হারিয়ে-যাওয়া লুসি গ্রে-র কথা ভেবে আমার রৌদ্রতপ্ত দুপুরগুলি উদাস হ'য়ে ওঠে। তারপর—আমি তখন আরো একটু বড়ো হ'য়ে উঠেছি—শীতের সন্ধ্যায় দাদামশাই আমাকে প'ড়ে শোনাতেন শার্ল হোমস-এর কাহিনী-পর্যায়, শেক্সপীয়র থেকে কোনো-কোনো দৃশ্য; পোর্শিয়া ও শাইলকের সঙ্গে, রজ়ালিণ্ড আর মিরাণ্ডার সঙ্গে, ব্রুটাস কেশিয়াস মার্ক অ্যাণ্টনির সঙ্গে তাঁরই মধ্যস্থতায় আমার প্রথম পরিচয় হয়। আর এমনি ক'রেই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি আমার অন্তরঙ্গ ক'রে তুলেছিলেন; তার মধ্যে কোথাও কোনো ভার বা পীড়ন্ আছে, তা আমাকে অনুভব করতে দেননি। আমার প্রায় মনেই পড়ে না আমি কী-ভাবে ইংরেজি পড়তে ও লিখতে শিখেছিলাম; সেজন্যে

আমার স্বাভাবিক উন্মুখতা যতটা দায়ী দাদামশায়ের প্রাণবন্ত শিক্ষকতাও ততটাই। স্পষ্টত, স্কুল-মাষ্টারিটাই তাঁর স্বাভাবিক বৃত্তি ছিলো, পুলিশে ঢুকে দু-দিক থেকেই ভুল করেছিলেন।

বাড়িতে একটি গ্রামোফোন ছিলো, মনে পড়ে। শুনেছি, আমার অজ্ঞান বয়সে, যখন পর্যন্ত পড়তে শিখিনি, আমি বলামাত্র যে-কোনো রেকর্ড বের ক'রে দিতে পারতাম—এতে বোঝা যায় ঐ চোঙ-লাগানো ধ্বনিযন্ত্রটি আমাকে কতদূর পর্যন্ত মুগ্ধ করেছিলো। সেই মুগ্ধতাবোধ আমার সাত বছর বয়স পর্যন্ত কাটেনি; আমি বাক্সের পাল্লা খুলে উঁকি দিয়ে দেখি ভিতরে কোনো মানুষ লুকিয়ে আছে কিনা; কুকুর অথবা ডানাওলা পরির ছবি-বসানো চকচকে গোল শব্দপ্রসবী চাকতি-গুলোকে এক অপার রহস্য ব'লে মনে হয় আমার। প্রায়ই শুনতাম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমার মনে আছে একটিমাত্র রেকর্ড—কোনো গান নয়, অসমমাত্রিক অমিত্রাক্ষর পয়ারে লেখা একটি নাটকের অংশ। তার প্রথম লাইন—'দ্যাখো, দ্যাখো, মধ্যম পাণ্ডব' আর শেষ লাইন—'আর কৃষ্ণনাম আনিবো না মুখে!'—এও আমি আজ পর্যন্ত ভুলিনি। খুব সম্ভব গিরিশচন্দ্রের কোনো নাটক, প্রধান অভিনেতা দানীবাবু*।

* এই লেখাটা 'দেশ' পত্রিকায় বেরোবার পরে দু-জন পাঠক আমাকে জানান যে রেকর্ডটা ছিলো গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবগৌরব' নাটকের একটি অংশ, প্রধান ভূমিকায় ছিলেন অমর দত্ত।

আমার দিদিমা কলকাতায় থিয়েটার দেখেছিলেন; তাঁর মুখে অমর দত্ত কুসুমকুমারীর নাম শুনতাম; মনে-মনে ভাবতাম — না জানি সেই মানুষেরা কেমন, কত আশ্চর্য!

গ্রামোফোনটি একদিন বেচে দেয়া হ'লো — পাছে আমার পড়াশুনো বিঘ্নিত হয়। আমার মনে কোনো অভাববোধ জাগলো না, ততদিনে বই পড়াই আমার প্রধান আনন্দ হ'য়ে উঠেছে।

৩

আমি আমার দাদামশাইকে ডাকতাম 'দা', দিদিমাকে 'মা' বলতাম। শুধু যে মুখে মা বলতাম তা নয়, তাঁকে মা ছাড়া অন্য কিছু আমি ভাবিনি কখনো, ভাবতে পারিনি। অথচ আমি খুব অল্প বয়সেই জেনেছিলাম আমার 'আসল' মা ম'রে গিয়েছেন, আমার বাবার সঙ্গেও আমার দেখাসাক্ষাৎ হ'য়ে গিয়েছে। মা নেই, মা আছেন; আমার 'মা'-র সঙ্গে আমার বাবার সম্পর্ক শাশুড়ি-জামাইয়ের, আমার 'মা'-র স্বামীকে আমি 'বাবা' ব'লে ডাকি না — এ-সব উল্টোপাল্টা ব্যাপার নিয়ে আমি কখনো বিব্রত বোধ করিনি, আমার কাছে এই অবস্থাই ছিলো সংগত এবং স্বাভাবিক। মা নেই — এটা হ'লো অস্পষ্ট এক প্রবচন, যাকে বলে 'কথার কথা' ঠিক তা-ই; আর মা আছেন — এটা অতি নিবিড় এক সত্য, যা আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি স্নেহে যত্নে আদরে

আবদারে, অসুখের সময় পরিচর্যায়। মাতৃহীন শিশুর মনোকষ্ট আমার জীবনের ত্রিসীমানায় ঢুকতে পারেনি।

আমার দিদিমার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে একটি ফোটো-গ্রাফ ছিলো — অনেক বাসা-বদল, বাসস্থান-বদল, ও অবস্থার বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তিনি সেটিকে রক্ষা করেছিলেন। ক্ষীণাঙ্গ এক যুবক, তার কাঁধে মাথা রেখেছে এক তরুণী — তরুণীটির মুখখানা গোল ছাঁদের, পিঠ-ছাপানো একঢাল চুল, কিন্তু চোখ তার বোজা, যুবকটি তাকে কোমরে জড়িয়ে ধ'রে আছে। মৃতা পত্নীকে নিয়ে আমার পিতা এই ছবি তুলিয়েছিলেন, তা জেনেও ছবিটির প্রতি কোনো আকর্ষণ বা আগ্রহ আমি অনুভব করিনি। আমি যখন কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা, আছি রাসবিহারী অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাটে, তখনও সেটি চোখে পড়েছে আমার — কিন্তু শুধু চোখেই পড়েছে, আমি সত্যি কখনো ছবিটির দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম এমন আমার মনে পড়ে না। বৈধব্যপ্রাপ্ত দিদিমার ঠাকুরপুজোর কোণটিতে প্রথমে থাকতো সেটি — ততদিনে হলদে এবং ঝাপসা হ'য়ে গিয়েছে — এদিকে যত দিন যায় তত বেড়ে চলে আসবাব এবং বইপত্র, সন্তানেরা বড়ো হ'তে থাকে, কিন্তু ফ্ল্যাটের মাপজোক একই থেকে যায়, বর্তমানের চাপে অতীতকে লুকোতে হয় কোণে-ঘুপচিতে, খাটের তলায় কোনো জীর্ণ তোরঙ্গে হয়তো। খুব স্বাভাবিকভাবেই ছবিটা হারিয়ে গেলো একদিন — কবে, আমি তা লক্ষ করিনি, তা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ অথবা অবকাশ আমার ছিলো না। কিন্তু এখন আমার ষাট-পেরোনো প্রান্তিক নির্জনতায়

ব'সে আমার মাঝে-মাঝে মনে পড়ে ছবিটিকে, সেটি হারিয়ে গেছে ব'লে ঈষৎ যেন দুঃখও হয়। আমার কৌতূহল মেটাবার জন্য কেউ যখন আর বেঁচে নেই, তখনই আমার জানতে ইচ্ছে করছে সে কেমন ছিলো — আমার নাৎনির বয়সী না-দেখা ঐ মেয়েটি ; কেমন ছিলো সে দেখতে, কেমন পছন্দ-অপছন্দ ছিলো তার, বই পড়তে ভালোবাসতো কিনা, আমার মধ্যে তার কোনো-একটি অংশ কি কাজ ক'রে যাচ্ছে ? মনে হয়, আমাকে জন্ম দেবার পরিশ্রমে যে-মেয়েটির মৃত্যু হয়েছিলো, তার কিছু প্রাপ্য ছিলো আমার কাছে ; তা দেবার সময় এখনো হয়তো পেরিয়ে যায়নি।

৪

সেকালের বাঙালিরা ছিলেন পল্লীপ্রাণ, জীবিকার দায়ে বারো মাসের মধ্যে দশ মাস তাঁরা শহরে কাটাতেন, কিন্তু মন তাঁদের পৈতৃক গ্রামে প'ড়ে থাকতো। কোনো মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ এলে তাঁদের মনে প্রথম প্রশ্ন জাগে পাত্রপক্ষের আদিবাসভূমি কোথায় ; কোনো ছুটির সময় কাছে আসামাত্র তাঁরা তল্পি বাঁধেন দেশে — অথবা পূর্ববাংলার ভাষায় 'বাড়ি' যাবার জন্য। ঘটনাচক্রে, অথবা আমার স্বভাবেরই নির্বন্ধে, আমি এই পল্লীকেন্দ্রিক অর্থে 'দেশের টান' কখনো অনুভব করিনি, যে-গ্রাম বা পরগনা বা জেলায় আমার পূর্বপুরুষ অনেককাল আগে ভিটে তুলেছিলেন, সেটাকেই বিশেষভাবে

আমার 'দেশ' ব'লে ভাবতে ছেলেবয়সেও পারিনি আমি। তবু তথ্যের দিক থেকে হয়তো বলা দরকার যে আমার মাতৃকুল ও পিতৃকুল দুয়েরই আদিনিবাস ছিলো বিক্রমপুরে—গ্রামের নাম যথাক্রমে বহর ও মালখানগর। পরবর্তী কালে যে-কন্যাকে বিবাহ করলাম তাঁর পিতৃভূমিও বিক্রমপুরেরই অন্তর্ভূত।

আমাদের পরিবারে স্থায়ী সদস্য ছিলো চারজন: আমি, দাদামশাই-দিদিমা, আর তাঁদের এক বৃদ্ধা বিধবা আত্মীয়া। কিন্তু আমার ছেলেবেলার অনেকটা অংশ কেটেছে এক বৃহৎ যৌথ পরিবারের মধ্যে, নানা দিক থেকে সম্পৃক্ত নানা বয়সের মামা মাসি দাদু দিদিমার সংসর্গে। তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো, কিন্তু যৌথ পরিবারের ভোজননির্ভর জটলামুখর আলস্যাশ্রিত আমোদপ্রমোদে আমি যোগ দিতে পারতাম না—আমার দিন কাটতো নিরিবিলি, আপন মনে, অধিকাংশ সময় শব্দহীনভাবে ব্যাপৃত। আমি অসময়ে কিছু খেতে চাই না, অচেনা লোকের মধ্যে প'ড়ে গেলে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকি, কোনো নিমন্ত্রণ-বাড়িতে যেতে হ'লে আমার মুখ শুকিয়ে যায়—এই সব কারণে বর্ষীয়সীরা আমাকে বলেন 'বুড়ো কত্তা', আব গুরুজনদের মধ্যে কেউ-কেউ আমাকে একাচোরা ব'লে নিন্দে করেন।

একবার ঢাকায় বেড়াতে এসে আমি তাসের নেশায় খুব মেতেছিলাম—আমার বয়স তখন সাত হবে কি আট। আছি আধো-পাড়াগেঁয়ে গেণ্ডারিয়ায় একটা গাছপালা-পুকুরওলা

একতলা বাড়িতে, আমার বয়সী আরো কয়েকটি ছেলেমেয়েও আছে; তাদেরই একজন আমাকে দীক্ষা দিয়েছিলো। ব্রে খেলা চলে, যে হেরে যায় তাকে গাধার আওয়াজে ডেকে উঠতে হয়: ভারি মজা। একদিন দুপুরে খাওয়ার পরেই জমিয়ে বসা হ'লো। আমার ভাগ্য ভালো ছিলো না সেদিন: কেবলই হেরে যাচ্ছি হাতের পর হাত; যত হারছি ততই রোখ চেপে যাচ্ছে, আর ততই অনিবার্য হ'য়ে উঠছে আমার হেরে যাওয়া। খেলা যখন থামলো তখন দিনের আলো নিবু-নিবু। আমি ছড়ানো তাস কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে এলাম—আমার মনে হ'লো আকাশ, বাতাস, গাছপালা সব ম'রে গিয়েছে, আমিও আর বেঁচে নেই। কাকে বলে বি-চ্ছি-রি, কাকে বলে বিস্বাদ—না-তেতো না-টক না-ঝাল না-মিষ্টি এমনি একটা কিছু-না-গোছের মনের অবস্থা, তা আমি সেদিন যেমন বুঝেছিলাম আমার এই দীর্ঘ জীবনে আর কখনো ঠিক তেমনভাবে বুঝিনি। উঠোনে ছিলো মস্ত একটা কালোজাম গাছ; আমি আস্তে-আস্তে তার তলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে একটি-একটি ক'রে সমস্ত তাস ছিঁড়ে ফেললাম, মনে-মনে বললাম—'জীবনে আর না।' এই প্রতিজ্ঞা আমি আক্ষরিক অর্থে পালন করতে পারিনি; কৈশোরে, তরুণীদের টান কাটাতে না-পেরে, আবার জুটে-ছিলাম ব্রে অথবা টোয়েন্টি-নাইনের আসরে; কিন্তু সেই ঝোঁকটা অল্পেই কেটে গিয়েছিলো—তারপর থেকে তাসের সঙ্গে আমার মুখ-দেখাদেখি নেই। আমার স্মৃতির উপর কালো ছায়ার মতো ঝুলে আছে জামতলার সেই সন্ধেবেলাটা—

আমি এখনো ভুলতে পারিনি—এখনো তাস ভাবতে আমার প্রায় ভয় করে।

৫

কুমিল্লা আমার জন্মস্থান, কিন্তু আমার স্মৃতির শুরু নোয়াখালিতে। মনে পড়ে ফেরুল-সাহেবের বাগান নামে একটি বাড়ি—উঠোন ঘিরে খানচারেক ঘর, দর্মার বেড়ার ফাঁকে-ফাঁকে সোনালি রোদ ঝিলমিল করে ভোরবেলা, খড়ের চালে মাটির মেঝেতে দুপুরবেলাগুলো ঠাণ্ডা। লাগোয়া এক মস্ত বড়ো বাগিচা—রোদের দিনে নীল সবুজ ঝাপসা এক আভার মতো। ফল এত প্রচুর যে মহিলারা ডাবের জলে পা ধোন, পাখিরা ঠুকরে-ঠুকরে জামরুল-কালোজাম শেষ করতে পারে না। কাছেই গির্জে—সেখানে মসৃণ ঘন ঘাসের বিছানায় হলদের উপর লাল-ছিটেওলা বড়ো-বড়ো কলাবতী ফুল ফুটেছে, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও শান্ত। কিন্তু আমি সেদিকে পা বাড়াতে লুব্ধ হই না—রবিবার সকালে শাদা প্যাণ্ট অথবা রঙিন ঘাঘরা-পরা যেসব কৃষ্ণাঙ্গ লোকেদের সেখানে দেখা যায় তাদের কেমন কিম্ভুত ব'লে মনে হয় আমার—না-বাঙালি, না-সাহেব, বড্ড বিজাতীয়।

কিন্তু আমার প্রথমতম স্মৃতি আরো আগেকার। পঞ্চাশ বছর আগে দেখা কোনো স্বপ্নের মতো, ধূসর অতীতে ট্রেনের কামরায় হঠাৎ-চোখে-পড়া কোনো মুখের মতো, কয়েকটা ছবি

আটকে আছে আমার মনে—সুদূর কিন্তু স্পষ্ট, যেন স্টিরিয়োস্কোপের মধ্য দিয়ে দেখা। আমি দুলে-দুলে পড়ছি—'আমি কেমন নাইতে পারি। মণি পারে না, টুনিও পারে না। তারা বলে, "আমরা গায়ে দল্ দেবো না।" তারা জলকে বলে দল্। ছেলেমানুষ কিনা, তাই।' কথাগুলোকে নিয়ে আমার জিভ যেন খেলা করছে, 'ছেলেমানুষ কিনা, তাই' বলতে গিয়ে আমি হেসে উঠছি খলখল ক'রে, বেগনি কালিতে ছাপা বড়ো-বড়ো অক্ষরগুলিতে কত যে খুশি পোরা আছে আমি যেন তার তল পাচ্ছি না। দুপুরবেলা কোনো-একটা ঘরে একলা আছি আমি; উঁচু ক'রে উল্টে-রাখা রাতের বিছানায় ঠেশান দিয়ে টকটকে লাল মলাটের মস্ত বড়ো সাইজের 'বালক' পত্রিকা পড়ছি—বা হয়তো শুধু কাঠের ব্লকে ছাপা জীবজন্তুর ছবিগুলো দেখছি—ঝিরঝির হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে—আমার খুব ভালো লাগছে। বিকেলে বেড়াচ্ছি পেরাম্বুলেটরে চ'ড়ে, আমার হিন্দুস্থানি দাই যশোদা আমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তার ধারে মাঠে চলছে টেনিস খেলা, একটা বল্ লাফাতে-লাফাতে আমার কোলে এসে পড়লো—খেলোয়াড় ভদ্রলোকেরা সেটি আমাকে দিয়ে দিলেন, আমি দু-হাতে আঁকড়ে ধরলাম সেই ধূসর-শাদা আঁটো নিটোল গোলকটিকে, মুখের কাছে তুলে নিলাম—বিকেলের রোদে রবারের গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। সন্ধেবেলার আবছা আলোয় উঠোন জুড়ে আলপনা দিচ্ছেন আমাদের বাড়ির বৃদ্ধা বিধবা, আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছি। উঠোনে জ্যোছনা ফুটলো, চালের

গুঁড়োর ফ্যাকাশে লাইনগুলোকে চকচকে শাদা দেখাচ্ছে এখন—বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার, দিদিমা আমাকে ডাল আর ডিমসেদ্ধ দিয়ে ভাত খাইয়ে দিচ্ছেন। আমার মাথা ঢুলে পড়ছে ঘুমে, লণ্ঠন থেকে দশটা আলোর তীর আমার অর্ধেক-বোজা চোখের মধ্যে বিঁধছে—আমার নাক টের পাচ্ছে মুসুর-ডালে তেজপাতার সুগন্ধ, সেদ্ধ ডিমের সরল কোমল মসৃণতা আমার জিহ্বাকে আদর করছে। এই স্মৃতিগুলির সময় আলাদা, ঘটনাস্থলও নিশ্চয়ই এক নয়—কোন বছরে, কোন শহরে এ-সব সুখ আমাকে ছুঁয়ে গিয়েছিলো, সে-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই—কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে আমার চেতনার প্রথমতম মিলনের চিহ্ন এগুলোই।

৬

বৃদ্ধা বিধবাটির বিষয়ে আরো কথা বলার আছে। তিনি সম্পর্কে ছিলেন আমার দাদামশায়ের মামিমা—বারদির নাগ-পরিবারে বাল্যবয়সে তাঁর বিবাহ হয়, বিবাহের স্বল্পকাল পরেই স্বল্পদৃষ্ট স্বামীকে হারান। কেমন ক'রে, ভাশুর দেওর ভাই ইত্যাদি নিকটতর সম্ভাবনা ছাড়িয়ে, তিনি তাঁর স্বামীর ভগিনী-পুত্রের সংলগ্ন হ'য়ে পড়েন, সে-ইতিহাস আমি জানি না; কিন্তু আমার সুদূরতম স্মৃতিতেও তাঁকে উপস্থিত দেখতে পাই। শ্বশুরকুল বা পিতৃকুলের অন্য কোনো আত্মীয়ের কথা তাঁর মুখে আমি কখনো শুনিনি, ভবসংসারে তাঁর আপন জন বলতে তিনি

চিন্তাহরণ-স্বর্ণলতাকেই বুঝতেন। শুধু একটিমাত্র ক্ষীণসূত্রে শ্বশুরকুলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি ; নাগ-পরিবারের সম্পত্তি থেকে বাৎসরিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি তাঁর বরাদ্দ ছিলো। সেই টাকা কখনো আসে, প্রায়ই আসে না ; সেটা নিয়মিত পাবার জন্য, এমনকি টাকার অঙ্ক বাড়াবার জন্য তিনি চেষ্টা করেন মাঝে-মাঝে — একে ধ'রে, তাকে ধ'রে করুণ সুরে বলেন তাঁর পাওনাটা যে ক'রে হোক আদায় ক'রে দিতে। এর বেশি তাঁর সাধ্য নেই, কেননা বৈষয়িক ব্যাপার তিনি কিছুই বোঝেন না, লেখাপড়াও খুব অল্পই জানেন। প্রায় কেউই কানে তোলে না তাঁর কথা—সকলেই জানে তাঁর টাকার কোনো দরকার নেই, তিনি এ-সব বলেন শুধু নিয়মরক্ষা হিশেবে, বা অন্য কেউ উস্কে দিয়েছে ব'লে। আর সেই সব বিরল দিনে, হঠাৎ তাঁর নামে মনি-অর্ডার এসে পৌঁছয় যখন, তিনি আঁকাবাঁকা অক্ষরে 'বামাসুন্দরী নাগ' সই ক'রে, এক গাল হেসে তাঁর বহুপ্রার্থিত পঞ্চাশটি টাকা ভাগনে-বৌয়ের হাতে তুলে দেন।

ছোট্ট মানুষ বামাসুন্দরী, গড়নটি ছিপছিপে পাৎলা — বা হয়তো তাঁর সুদীর্ঘকালের উপবাসবহুল জীবনযাত্রা তাঁর দেহে এক ফোঁটা চর্বি জমতে দেয়নি। মাথার কাঁচা-পাকা চুল চাঁদি-সমান ছোটো ক'রে ছাঁটা, থান-ধুতির আঁচলটাই তাঁর গায়ের আবরণ। আমি তাঁকে দেখেছিলাম অন্তত বাইশ বছর ধ'রে একটানা—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় একই রকম। অতগুলো বছরের মধ্যে তাঁর বার্ধক্য যেন বৃদ্ধি পায়নি, চুল ধবল হয়নি, লোল হয়নি চামড়া, তাঁর দেহ ছিলো সচল আর মন

ভ্রান্তিহীন। শুধু শেষের দিকে একটু বেশি নুয়ে পড়েছিলেন হয়তো, আর ছুঁচে সুতো পরাতে হ'লে আমার কাছে নিয়ে আসতেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো আমারই কাছে—কলকাতায়—বিনা রোগে, বিনা যন্ত্রণায়, অল্প কয়েকদিন শুয়ে থাকার পরে। তাঁর বয়স তখন কত হয়েছিলো আমি জানি না — নিশ্চয়ই আশি পেরিয়েছিলো, নব্বুই হ'লেও হ'তে পারে।

আজকের দিনে বামাসুন্দরীর কথা ভাবলে আমার মনে হয় তিনি তাঁর বৈধব্যজনিত বঞ্চনার উপর চেষ্টাহীনভাবে জয়ী হয়েছিলেন। অন্য অনেক বিধবার মধ্যে যে-মানসিক মালিন্য বা অম্লতা বা দীনতা আমি লক্ষ করেছি, তার সংক্রাম তাঁকে ছুঁতে পারেনি কখনো। মৃদু ও স্নিগ্ধ তাঁর স্বভাব, কোনো কারণেই তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কটু কথা বেরোয় না, সর্বদাই তিনি প্রসন্ন ও অভিযোগহীন। তাঁকে দিনমান দেখি কোনো-না-কোনো কাজ নিয়ে ব্যাপৃত—বাধ্য হ'য়ে নয়, তাঁর নিজেরই গরজে। ভোরে উঠে গোবর-ছড়া দেন সারা উঠোনে — বাঁ হাতে কোমরের কাছে পাত্রটি ধ'রে ডান হাতে গোবর-জল ছিটোতে-ছিটোতে এগিয়ে যান—তালে-তালে পা ফেলে, মুহূর্তের জন্য না-থেমে — তাঁর হাত পা কোমরের ভঙ্গি নর্তকীর মতো সাবলীল। সরু ক'রে লাউ কুটতে, সুপুরি কাটতে তিনি ওস্তাদ; তাঁর হাতের নিরামিষ রান্না আমার মনে হয় অমৃতের মতো সুস্বাদু। ডালের বড়ি, কাসুন্দি আচার আমসত্ত্ব, আস্কে-পিঠে আর পাটিসাপটা, তিলের নাড়ু, চিঁড়ের মোয়া নারকোলের মিষ্টি — ঋতু অনুসারে এ-সব দ্রব্য তিনি নিখুঁত-

ভাবে রচনা করেন, আর অন্য সব কাজ ফুরিয়ে গেলে ব'সে যান কাঁথা-সেলাই নিয়ে। তাঁকে আমি কখনো দেখিনি অসুস্থ হ'তে, কখনো দিনে ঘুমোতেও দেখিনি। উপন্যাস পড়ার মতো বিদ্যে নেই তাঁর, যাকে বলে 'ধর্মকর্ম' সেদিকেও তেমন অভিনিবেশ নেই; কিন্তু যেহেতু তাঁর কাজ এত প্রচুর, আর কাজেই তিনি সুখ পান, তাই তাঁর হাতে সময় কখনো ভারি হ'য়ে ওঠে না — তাঁর প্রতিটি দিন ভরপুর।

বামাসুন্দরী কোনো গুরুর ভজনা করেননি, তীর্থদর্শনের জন্য কাঙাল হয়নি তাঁর মন, সংসার ছেড়ে কাশীবাসী হ'তেও ইচ্ছে করেননি কখনো। কিন্তু বাড়ির মধ্যেই কয়েকটি নিরভিমান অনুষ্ঠান-পালনে তাঁর আগ্রহ ছিলো। রোজ সকালে মাটি দিয়ে একটি শিবলিঙ্গ গড়েন, বেলা হ'লে ফুল বেলপাতা কমণ্ডলুর জলে পুজো ক'রে বিসর্জন দেন সেটিকে, একটা অদ্ভুত কায়দায় জিভ নেড়ে-নেড়ে ববম্‌ববম্‌ শব্দ করেন পুজোর শেষে। আমরা যখন যে-বাড়িতে থাকি সেখানেই তাঁর যত্নে একটি তুলসী-গাছ লালিত হয়, সন্ধেবেলা তিনি মাটির দীপ জ্বেলে দেন সেখানে; মাঝে-মাঝে, ছোটো ছেলেমেয়ের দল জুটিয়ে হরিলুঠের আসর জমাতেও তাঁর ভুল হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার তিনি মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করেন — আমার পক্ষে অতি সুখের সেই ঘটনা, কেননা পুজো-আর্চার শেষে বামাসুন্দরী মঙ্গলচণ্ডী-ব্রতকথা শোনান। তিনি বলেন কথকতার ঢঙে সুর ক'রে, প্রতিদিন একই সুরে, অবিকল এক ভাষায় প্রতিদিন। কোনো পুঁথির সাহায্য নেয়া সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে, তা নেবার কোনো

প্রয়োজনও হয় না — কেননা সবই তাঁর কণ্ঠস্থ, তিনি যাঁর মুখে শুনে-শুনে শিখেছিলেন তাঁরও নিশ্চয়ই কণ্ঠস্থ ছিলো। এক গৃহিণী মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় ধনে-জনে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠলেন, কিন্তু অত সুখ তাঁর সহ্য হ'লো না; তিনি চাইলেন কোনো দারুণ দুঃখ, দুঃসহ ক্ষতি, কিন্তু ছেলেকে বিষের নাড়ু পাঠিয়েও পারলেন না নিজের কোনো অনিষ্ট ঘটাতে — যতদিন না, স্যাঙাৎনির পরামর্শে, তিনি মঙ্গলচণ্ডীকে পরিত্যাগ করলেন। এ-ই হ'লো কাহিনীর চুম্বক, যদিও এর সমাপ্তি অবশ্য সুখের — মঙ্গলচণ্ডী ব্রত নতুন ক'রে শুরু করামাত্র ভদ্রমহিলা তাঁর লুপ্ত ঐশ্বর্য ফিরে পেলেন, মৃতেরা সুদ্ধ বেঁচে উঠলো আবার। এই রূপকথা — যা কোনো বইতে আমি পড়িনি — তা আমার বয়ঃপ্রাপ্ত জীবনে বারে-বারেই মনে পড়েছে আমার; নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ যে ক্লান্ত ও জীর্ণ ও নির্জীব ক'রে দেয় মানুষকে, আমাদের জীবনে দুঃখও যে জরুরি একটি উপাদান — আমার মনে হয়েছে এই কথাটাই এর বার্তা।

অন্য একটি ঘটনা মনে পড়ে। আমার দাদামশায়ের এক তরুণবয়সী ভ্রাতৃবধূ তাঁর সদ্যপ্রাপ্ত বৈধব্য ও বালক-পুত্রকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। তাঁর সান্ত্বনার জন্য এক পূজারি ব্রাহ্মণকে ডাকা হ'লো; তিনি গীতা থেকে প'ড়ে শোনালেন — প্রথমে সংস্কৃতে, তারপর বাংলায় ব্যাখ্যা ক'রে-ক'রে। 'লোকেরা যেমন পুরোনো কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরে, তেমনি…' এ-সব কথা ঐ শোকার্তাকে শোনানো সেই বালকবয়সেই আমার প্রহসন ব'লে মনে হয়েছিলো, কিন্তু

'বাসাংসি জীর্ণানি'র শব্দসমাবেশ কেমনযেন কাঁপিয়ে দিয়েছিলো আমাকে — উপমা কাকে বলে তা না-জেনেও উপমাটিকে আমি ভালোবেসেছিলাম। সংস্কৃত কবিতার ধ্বনিকল্লোলের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয় — এমন একটা সময়ে, যখন সংস্কৃত ব'লে যে আলাদা একটা ভাষা আছে তাও হয়তো আমি জানি না।

৭

ক্ষুদ্র এক মফস্বল শহর, নোয়াখালি। কোনো ঐতিহাসিক স্মৃতির সঙ্গে জড়িত নয়, ইসলামধর্মের প্রাধান্য সত্ত্বেও মোগল-পাঠানের কোনো পদচিহ্ন নেই এখানে, নেই কোনো সাবেক কালের মসজিদ না মঞ্জিল, যা লোককে ডেকে দেখানো যায়। আঞ্চলিক ভাষায় উর্দুর অনুপ্রবেশ ঘটেনি, কিন্তু মগ শব্দ অজস্র, আর বাচনভঙ্গি ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ এত অদ্ভুত যে আমরা কাঠবাঙালরাও সব কথা বুঝতে পারি না। এককালে পর্তুগীজ বোম্বেটেরা এই পূর্বতটরেখায় দাপাদাপি ক'রে বেড়িয়েছে — সেই সব দুর্ধর্ষ পুরুষের এক শেষ বংশধরকে আমি চোখে দেখেছিলাম। তাম্রবর্ণ খর্বকায় এক প্রৌঢ়, সারাদিন শুধু পথে-পথে ঘুরে বেড়ায় সে, রাস্তার লোক ধ'রে-ধ'রে খাশ নোয়াখালির বুলিতে অত্যন্ত দ্রুত লয়ে কথা বলে। বালক আমাকেও সে তার শ্রোতা ক'রে নিয়েছিলো একদিন, হয়তো তার জীবনবৃত্তান্ত শুনিয়েছিলো — তা থেকে শুধু এই কথাটি আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে 'তামুক' খেতে সে ভালোবাসে।

পূর্ব-দক্ষিণ বাংলায় মেঘনা যেখানে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে সেখান থেকে নোয়াখালি খুব কাছেই। কিন্তু এই ভৌগোলিক সংস্থানের জন্য কোনো মর্যাদা পায়নি এই শহর — নদীটি নাব্য নয় ব'লে হ'তে পারেনি কোনো বাণিজ্য-কেন্দ্র, চট্টগ্রাম অদূরে ব'লে কোনো সামরিক আস্তানাও হ'লো না। যেন প'ড়ে আছে ভারতবর্ষ ও বঙ্গভূমির এক প্রান্তে — অখ্যাত এবং প্রায়-অজ্ঞাত — বৃটিশ সাম্রাজ্যের দুর্নিরীক্ষ্য এক বিন্দু, কাচারি আদালত থানা পুলিশ জেলখানা নিয়ে বিশাল প্রশাসন-যন্ত্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক অংশ মাত্র। এখানে শিক্ষিতেরা সকলেই প্রায় সরকারি চাকুরে, বা উকিল মোক্তার স্কুল-মাষ্টার — অন্যেরা দোকান চালায় বা শহরে আসে মামলার দায়ে বা বেচাকেনা করতে। ছেলেদের জন্য হাইস্কুল আছে তিনটি, কিন্তু একটিমাত্র মেয়েদের স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর উপরে পড়ানো হয় না। হাটে-বাজারে মাছ দুধ শাকসব্জি ওঠে প্রচুর, কিন্তু অন্য সব দ্রব্য নেহাৎই আটপৌরে গোছের — আর শুধু একটি দ্রব্যেই নোয়াখালির কোনো বৈশিষ্ট্য ধরা প'ড়ে। বিরাট স্তূপে প'ড়ে থাকে রাশি-রাশি কী-একটা জিনিশ — শুকনো এবং বিবর্ণ এবং আকৃতিহীন — আমি ভাবতাম জ্বালানি-কাঠ হবে বুঝি, একদিন শুনলাম সেগুলোই শুঁটকি মাছ।

জীবন চলে মন্থর, বিশ-শতকী ব্যস্ততা থেকে সুদূর, দিনের পর দিন একই বৃত্তে ঘুরে-ঘুরে। লোকেরা কর্মস্থলে যায় এবং ফিরে আসে, দোকান খোলে এবং দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে — সবই পান-চিবোনো মৃদু ছন্দে, প্রতিযোগিতার সুযোগ নেই

ব'লে কোনো তীব্র সুর কখনো বেজে ওঠে না। শহরের মধ্যে এমন কোনো দূরত্ব প্রায় নেই যা অক্লেশে হেঁটে পেরোনো না যায়, তবু যাঁরা অতিমাত্রায় দ্রুতিপ্রেমিক তাঁরা সাইকেল চালান। কোনো-এক আবদুল করিম বা রহমৎ খাঁর পরিচালিত একটি কি দুটি ঘোড়ার গাড়ি আছে—বাবুরা তা ব্যবহার করেন শুধু মালপত্র নিয়ে সপরিবারে রেল-স্টেশনে যাবার জন্য, আগের দিন ব'লে রাখলে তবে সময়মতো পাওয়া যায়। বিকল্প যান—গোরুর গাড়ি, সেটা অনেক বেশি জনপ্রিয়। একটি যাত্রী-ট্রেন আসে চাঁদপুর থেকে ভোরবেলা, সন্ধের আগে আবার চাঁদপুরের দিকে রওনা হ'য়ে যায়—বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র উপায় সেই ট্রেন। রাত্রে রাস্তায় আলো জ্বলে না, বা জ্বললেও কেরোসিনের কালিমার তলায় প্রচ্ছন্ন থাকে—লোকেরা বেরোয় লণ্ঠন আর কেউ-কেউ সাপের ভয়ে লাঠি হাতে নিয়ে। আর বেরোবার মতো উপলক্ষও যে লোকেদের খুব বেশি জোটে তা নয়, এবং অন্য এক কারণেও রাতের ঘণ্টাগুলোকে ছাঁটাই করার প্রয়োজন ঘটে। সন্ধে নামতেই মশারা এমন বিস্তীর্ণভাবে দখল ক'রে নেয় শহরটিকে, তারা গর্জনে এত প্রবল আর দংশনে এত সুতীক্ষ্ণ ও অপ্রতিহত, যে ন-টার মধ্যে আহারাদি সেরে মশারির তলায় পলায়ন ছাড়া নিরীহ ভদ্রলোকের আর-কোনো উপায় থাকে না।

কয়েকটা মনোরম ছবিও চোখে আছে আমার। গাছপালা অজস্র, যেখানে-সেখানে পুকুর, সারা শীত গৃহস্থের উঠোন আলো ক'রে রেখেছে লাল আর হলদে রঙের গাঁদাফুল, ফুটে

আছে পথের ধারে-ধারে পাতার ঝাঁকে রক্ত-লাল জবা আর হলুদ-রাঙা ঘণ্টার মতো টগর, কোনো-এক সরকারি আপিশের বাগানে রঙে-রং-মেশানো বিচিত্র সব পাতাবাহার, চৈত্রমাসে আগুন-লাল শিমুল ফেটে গিয়ে ছোটো-ছোটো তুলোর বল্ হাওয়ায় ভাসে। হলুদ আর টকটকে লাল শুকনো পাতার উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায় গোসাপ--মানুষের সঙ্গে দেখা হ'লে চকচকে চোখে তাকিয়ে থাকে। আছে রৌদ্রের জীব প্রজাপতি অনেক, অন্ধকারে ঝকঝকে সবুজ জোনাকির ঝাঁক। আছে আকাশ-জোড়া ঝিমঝিম জ্যোৎস্না, আর শীতের জ্যোৎস্নায় ঘন কুয়াশার আস্তরণ, যাতে চেনা জিনিশ রহস্যময় হ'য়ে ওঠে, হঠাৎ তাকালে মানুষ বা মানুষের মতো আকৃতি দেখা যায়। আর অবশ্য নদীও আছে—কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেটা মনোরম নয়।

৮

নোয়াখালির মেঘনার মতো এমন হতশ্রী নদী পৃথিবীর অন্য কোথাও আমি দেখিনি। রুক্ষ পাড়ি, ঘাট নেই কোথাও, কেউ নামে না স্নান করতে, কোনো মেয়ে জল নিতে আসে না। তরণীহীন, রঙিন পালে চিহ্নিত নয়, জেলে-ডিঙির সঞ্চরণ নেই—একটিমাত্র খেয়া-নৌকো দেহাতি ব্যাপারিদের নিয়ে সকালে-সন্ধ্যায় পারাপার করে। শহরের এলাকাটুকু পেরোলেই নদীর ধারে-ধারে ঘন বনজঙ্গল, নয়তো শুধু বালুডাঙা, মাঝে-মাঝে চোরাবালিও লুকিয়ে আছে—শীতে গ্রীষ্মে বিস্তীর্ণ চরের ফাঁকে-

ফাঁকে শীর্ণ জলধারা ব'য়ে যায়। বর্ষায় স্ফীত হ'য়ে ওঠে নদী—বিশাল—অন্য তীর অদৃশ্য; কিন্তু তখনও চোখ খুশি হ'তে পারে না, বরং আমার ভয় করে সেই কালচে-ব্রাউন বিক্ষুব্ধ জলরাশির দিকে তাকাতে—যার উপর দিয়ে, বর্ষার ক-মাস, একটি নিঃসঙ্গ স্টিমার যাতায়াত করে হাতিয়া-সন্দ্বীপে—পৃথিবী-ত্যক্ত দুই দ্বীপ, যেখান থেকে প্রায়ই ভেসে আসে সর্পদংশনের ভীষণ সব কাহিনী। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ঝড়ের সংকেত আসে মাঝে-মাঝে, ঘূর্ণি হাওয়ায় এঁকে-বেঁকে পাৎলা বৃষ্টি পড়ে সারাদিন—বারো-শো ছিয়াত্তর বা অন্য কোনো দূর-বছরের বন্যাব স্মৃতি লোকেদের বুকের মধ্যে দুরুদুরু করে*। আর এই সব-কিছুর উপরে আছে—ভাঙন, অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য ভাঙন। প্রতি বর্ষায় নদী এগিয়ে আসে শহরের মধ্যে—প্রায় লাফিয়ে-লাফিয়ে—বিরাট বুড়ো বটগাছ আর অগুনতি পাখির বাসা নিয়ে মস্ত বড়ো মাটির চাঁই ধ্ব'সে পড়ে হঠাৎ, ধোঁয়া ওঠে জলের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই নদী আবার নির্বিকার। আমি একাধিকবার এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলাম—একবার কিছুটা বিপজ্জনকভাবে। শোনা গেলো অমুক সাহেবের বাংলোকে নদী ধ'রে ফেলেছে, তিনি সব জিনিশপত্র শস্তায় বেচে

*এক পাঠক আমাকে রাজকুমার চক্রবর্তী প্রণীত 'সন্দ্বীপের ইতিহাস' থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত ক'রে পাঠিয়েছেন; তাতে জানা যায় সন্দ্বীপ দু-বার বন্যায় বিধ্বস্ত হয়েছিলো—বঙ্গাব্দ ১২৩২ ও ১২৮৩ সালে—শেষেরটি 'তিরাশি সনের ঢল' নামে নোয়াখালি জেলায় কথিত হ'য়ে থাকে।

দিয়ে চ'লে যাচ্ছেন — রোববার সকালে দাদামশাই আমাকে নিয়ে হাজির হলেন সেখানে, আমার পড়ার মতো কোনো বই যদি বা পাওয়া যায়। আমরা যখন একমনে বই দেখছি, ঠিক তখনই প্রচণ্ড শব্দে পাশের ঘরটি ধ্ব'সে পড়লো — একটি ফিরিঙ্গি যুবক জানলা দিয়ে লাফিয়ে প'ড়ে প্রাণ বাঁচালো, বরাতজোরে সে-ঘরে তখন আর কেউ ছিলো না। মুহূর্তের মধ্যে সব লোক বেরিয়ে এলো রাস্তায়, দাদামশাই কাঁপতে-কাঁপতে আমার হাত ধ'রে বাড়ির পথ ধরলেন, কিন্তু তার আগেই তিনি জুটিয়ে ফেলেছিলেন আমার জন্য এক বাণ্ডিল বাছা-বাছা বই।

এই বাংলোটি ছিলো শহরের দক্ষিণ প্রান্তে—আমার ছেলেবেলার নোয়াখালির সেটাই অভিজাত পল্লী। সুন্দর বেড়াবার রাস্তা, ঊর্ধ্বতন সরকারি চাকুরেদের জন্য বড়ো-বড়ো কম্পাউণ্ডওলা বাড়ি, পানীয় জলের জন্য সুরক্ষিত চোখ-জুড়োনো 'বড়ো দিঘি'—এই সব ছিলো সেখানে, আর আমি কিছুটা বড়ো হ'য়ে উঠতে-উঠতে এই সবই জলের তলায় অদৃশ্য হয়েছিলো। আমরা যখন নোয়াখালি ছেড়ে চ'লে আসি তখন নদী প্রায় শহরের মধ্যিখানে এসে পড়েছে। যে-নোয়াখালিতে আমি ছিলাম, যার মানচিত্রের একটি রেখাও আমার মনে ঝাপসা হয়নি এখনো, সেটিকে এখন অবলুপ্ত ব'লে ধ'রে নিলে আমি বোধহয় ভুল করবো না। তথ্য হিশেবেও সেটাই ঠিক ব'লে জানি।

কিন্তু এই ধ্বংসপরায়ণ মেঘনাই নোয়াখালিকে দিয়েছিলো তার সংবৎসরের শ্রেষ্ঠ দৃশ্য, বৃহত্তম ঘটনা — তার ভার্বি,

তার রথের মেলা, তার মোহনবাগান-ঈস্ট-বেঙ্গল ফাইনেল। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের অমাবস্যায়, মধ্যাহ্নের কোনো-এক লগ্নে সমুদ্র থেকে বান আসে নদীতে — স্থানীয় ভাষায় বলে 'শর'। ঘরে-ঘরে সেদিন সকাল থেকে চাঞ্চল্য, একটা উৎসবের ভাব। আমার যতদূর মনে পড়ে, স্কুলগুলোতে ছুটি থাকতো কিছুক্ষণ, কাচারি-আদালতেও কাজকর্ম স্থগিত — সেই সময়-টুকুর জন্য সকলেই সেদিন নদীর ধারে, অন্তঃপুরিকা মহিলারাও ভালো কাপড় প'রে দিনের আলোয় বেরিয়ে এসেছেন। যতদূর মনে পড়ে, দিনটি থাকতো প্রতি বছরই রৌদ্রোজ্জ্বল। আমরা দাঁড়িয়ে আছি পূর্বদিগন্তে তাকিয়ে — শাস্তাসীতার মোহানার দিকে — যেখানে ম্লান-সবুজ বনরেখার পরে মস্ত একটা দুয়ার যেন খুলে গেছে, আকাশ নুয়ে পড়েছে জলের উপর — তাকিয়ে আছি সেই ঝাপসা-ধোঁয়াটে অগ্নিকোণের দিকে, যেখান থেকে অগ্নিবর্ণ সূর্যের উদয় শীতের ভোরে অনেকবার আমি দেখেছি, আর যেখান থেকে, একটু পরেই, যে-কোনো মুহূর্তে, সমুদ্রের ঢেউ ছুটে আসবে আমাদের চোখের সামনে। ঐ আসছে।

দুধের মতো শাদা একটি ফেনিল রেখা প্রথমে, তারপর শোঁ-শোঁ শব্দে সমুদ্র এলো ঝাঁপিয়ে — মস্ত বড়ো নদীটা যেন দুলে, ফুলে, গ'র্জে উঠে আরো অনেক প্রকাণ্ড হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো — তার বিস্তার জুড়ে হাজার ঘোড়ার দাপাদাপি, হাজার স্টিমারের এঞ্জিন যেন পাকে-পাকে ছিটিয়ে দিচ্ছে তার ফেনা, তার ঘূর্ণি, তার সব নীল কালো বেগনি বাদামি শাদা

রঙের ঝলক—দুপুরবেলার রোদ্দুরে আরো উজ্জ্বল—এক বিপুল রঙ্গ ঢেউ তুলে-তুলে পশ্চিম দিকে ছুটে চ'লে গেলো। দৃশ্যটির মেয়াদ হয়তো পাঁচ মিনিটের বেশি হবে না, কিন্তু লোকেরা তা নিয়ে বলাবলি করে অনেকক্ষণ—কেমন হ'লো এবার, আগের বছরের চাইতে ভালো, না কি এবারে তেমন জমলো না?

জীবনে আমি প্রথম যে-কবিতাটি লিখেছিলাম, সেটি এই নদীর সঙ্গেই সম্পৃক্ত।

৯

একবার আমরা ছিলাম এমন একটি বাড়িতে, যা নোয়াখালির সবচেয়ে ভালোর মধ্যে একটি—পূর্বোল্লিখিত দক্ষিণপ্রান্তিক অভিজাত পাড়াতেই। নোয়াখালিতে এটা আমাদের চতুর্থ বাসা, পাকা বাড়ি এটাই প্রথম ও একমাত্র। আমাদের সঙ্গে থাকতে এলেন আমার দিদিমার দুই সন্তানবতী ও অন্তঃসত্ত্বা ভ্রাতৃবধূ—একজনের স্বামী টুরের চাকরিতে ভ্রাম্যমাণ, অন্যজনের ডাক্তার-স্বামী যুদ্ধের অফিসার হ'য়ে মিশরে গেছেন—তখন প্রথম-মহাযুদ্ধ চলছে। সেইজন্যে বড়ো বাড়ির দরকার হ'লো।

কিন্তু 'বড়ো বাড়ি' বলতে মধ্যবিত্ত বাঙালির মনে যে-ছবি ফোটে এটি ঠিক সে-রকম নয়; এর মাপজোক গড়নপেটনের সঙ্গে আমাদের তখনকার বা এখনকার ধারণার কোনো মিল

নেই। যাকে বলা হয় 'কলোনিয়েল স্টাইল', যার তুটি-চারটি জীর্ণ নমুনা কলকাতার চৌরঙ্গি পাড়ায় বা মফস্বলের পুরোনো কোনো ডাকবাংলোতে এখনো দেখা যায়, সেই ছাঁদের বাড়ি—লোকেরা বলে ডেলনি-হাউস—আদি যুগে খুব সম্ভব কোনো হার্মাদ—মানে, পর্তুগীজের কুঠি ছিলো। মস্ত উঁচু প্লিন্থের একতলা, দশ-বারো ধাপ দীর্ঘাকার সিঁড়ি উঠে চওড়া একটি বারান্দা পাওয়া যায়, সামনে তুটো প্রকাণ্ড হল্-ঘর পাশাপাশি, তু-পাশে আরো তুটো ঘর যেগুলিকে সংসর্গের জন্য ছোটো দেখালেও আসলে বেশ হাত-পা-ছড়ানো, প্রায় সেই মাপেরই হাত-কমোড-বসানো বাথরুম, খাবার ঘরটির এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে কাউকে ডাকলে অন্য প্রান্ত থেকে সে শুনতে পায় না। এ ছাড়া আর-একটি বারান্দা আছে পিছন দিকে, টালির ছাদের আলাদা রান্নাবাড়ি, গোসলখানা—আর পশ্চিমে আরো তুটো ঘর যেগুলো আমাদের অধিকারভুক্ত নয়, সেখানে এক জমিদারের শেরেস্তা বসে। শোনা যায় এর প্রথম মালিক লবণের ব্যাবসায় পয়সা করেন, বাড়ির তলায় মস্ত বড়ো আস্তাবল ছিলো তাঁর — প্লিন্থ-এর গায়ে সারি-সারি তোরণাকৃতি ফোকরগুলো ছিলো ঘোড়াদের যাওয়া-আসার দরজা।

আমরা যখন প্রথম এলাম, তখন দক্ষিণের বারান্দা থেকে নদী দেখা যায়, কিন্তু প্রথম বর্ষা কেটে যাবার পরেই নদী অনেক এগিয়ে এলো, দ্বিতীয় বর্ষায় বড়োদের মুখে বলাবলি শুনলাম এ-বাড়িতে আর বেশিদিন থাকা যাবে না। একদিন সন্ধেবেলা দক্ষিণের ছোটো ঘরে ব'সে হঠাৎ একটা কবিতা লিখে

ফেললাম—ইংরেজিতে। ছ-সাত স্ট্যানজার কবিতা—প্রথমটা আমার মনে আছে এখনো।

Adieu, adieu, Deloney House dear,
We leave you because the sea is near,
And the sea will swallow you, we fear.
Adieu, adieu.

ইংরেজিতে কেন? আমি জানি না—ইংরেজিতে এসেছিলো, এ ছাড়া আমার কোনো উত্তর নেই। কিন্তু ইংরেজিতে কেন 'এসেছিলো', তারও কোনো কারণ আছে নিশ্চয়ই? আমার বয়স তখন নয় হবে বা কিছু বেশি, হেম নবীন মধুসূদনের সঙ্গে চেনাশোনা হচ্ছে, আমি জানি এবং মানি এঁরা 'বড়ো' কবি, 'মহাকবি'—কিন্তু আসলে হয়তো অনেক বেশি ভালো লাগছে 'ওয়ান থাউজেণ্ড অ্যাণ্ড ওয়ান জেম্‌স অব ইংলিশ পোইট্রি' নামে লাল মলাটের মোটা বইটা—আমার পুরোনো এক সঙ্গী যার ছোটো-ছোটো অক্ষরে আমি প্রথম পড়েছিলাম ওঅর্ডস্বার্থ, কূপার, টমাস গ্রে-র এলিজি, এরিয়েল-এর গান। আসলে আমার জীবনে তখনও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়নি, শৈশবোত্তর বাংলা কবিতার অমৃতস্বাদ আমি পাইনি তখনও। হয়তো সেইজন্যেই এই বিদেশী ভাষায় ডেলনি-হাউসকে বিদায় জানিয়েছিলাম।

ঐ ইংরেজি পদ্যটা বিশুদ্ধ এক দৈব ঘটনা। 'হাসিখুশি' 'হাসিরাশি'র আমল থেকেই ছন্দোবদ্ধ রচনা আমি ভালোবেসেছি, নামতা অথবা সংস্কৃত শব্দরূপের চেয়ে অনেক সহজে তা মুখস্থ হ'য়ে গেছে আমার—কিন্তু আমি নিজে ঐ

জাতীয় কিছু রচনা করবো; এমন ইচ্ছে বা কল্পনা এর আগে আমার মনে জাগেনি কখনো। কিন্তু প্রথম পাপটি ক'রে ফেলার পর, আমি কবিতাকে আর ছাড়তে পারলাম না, অথবা কবিতাই আর নিস্তার দিলো না আমাকে—কিন্তু এর পর থেকে যা-কিছু লিখি, সবই বাংলায়। কেন ইংরেজি ছেড়ে বাংলা ধরলাম সেটাও আমি বলতে পারবো না—কেউ আমাকে পরামর্শ দেননি, ব'লে দেননি বাংলায় লিখতে, আর ভেবে-চিন্তে বেছে নেবার মতো বুদ্ধি যে আমার তখনও হয়নি, তা অবশ্য না-বললেও চলে।

প্রায় রোজই লিখি একটি-দুটি পদ্য, রুল-টানা বাঁধানো খাতায় আসমানি রঙের জে. বি. ডি. কালিতে, খাগের বা পালকের বা স্টিল-নিবের কলম চালিয়ে—লিখি নিয়ম ক'রে, মাষ্টারমশাই যেমন স্কুলের ছেলেকে হোম-ওঅর্ক দেন, তেমনি আমি নিজেই নিজেকে টাস্ক দিয়েছি। বিষয়গুলি খুব গতানুগতিক—'নদী', 'সন্ধ্যা', 'প্রভাত', 'সূর্যাস্ত'—এই ধরনের, আমার চলন টলোমলো, ছন্দ ভাঙাচোরা, আমার মডেল বোধহয় 'সদ্ভাবশতক' বা মানকুমারী বসুর কবিতা। কিন্তু ক্রমশ এই ছেলেমানুষি চেষ্টা আমাকে সুখ দিতে লাগলো, আমার কলম হ'য়ে উঠলো দ্রুত-সচল, ডেলনি-হাউস ছেড়ে যাবার আগেই আমি পয়ারে-ত্রিপদীতে একটা সপ্তকাণ্ড রামায়ণও লিখে ফেলেছিলাম, মনে পড়ে — খুব খুশি হয়েছিলাম লিখে উঠে — কিন্তু সম্ভবত সেটা 'ছোট্ট রামায়ণে'রই চর্বিতচর্বণ।

এই সময়কার আর-একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

দিদিমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছি চট্টগ্রামে, তাঁর দেবর সেখানে টেলিগ্রাফ-মাষ্টার—আমাদের এস্কর্ট এসেছেন দিদিমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্র, ইতিহাসে অনার্স নিয়ে টাটকা বি. এ. পাশ করেছেন তিনি। চট্টগ্রামে আমি প্রথম দেখলাম পাহাড় বা অন্তত পাহাড়ের কাছাকাছি কোনো আকৃতি, কোনো উচ্চভূমি—আর মনে পড়ে চারদিকে সবুজের আভা, সময়টা বর্ষা ছিলো, দিন মেঘলা। কিন্তু যে-কারণে সেই ক্ষণদৃষ্ট শহর আমার পক্ষে স্মরণীয় হ'য়ে আছে তার কারণ একজন মানুষ—একটি মেয়ে—আমাদের গৃহস্বামীর কিশোরী কন্যা, ছানা। তার সঙ্গে সত্যেন্দ্রর দেখা হওয়ামাত্র দু-জনের মধ্যে কী-যেন একটা ঘ'টে গেলো, আমি সেটা অনুভব করলাম—চোখে দেখলাম বললেও অত্যুক্তি হয় না।

দিদিমা এসেছিলেন দু-এক সপ্তাহ কাটিয়ে যাবেন ব'লে, কিন্তু তিন দিন পরেই নোয়াখালি থেকে টেলিগ্রাম এলো এক আত্মীয়ার হাত ভেঙে যাওয়ার খবর নিয়ে—অবিলম্বে ফিরে যেতে হ'লো আমাদের। কিন্তু মনের কোনো-কোনো বিশেষ অবস্থায় তিন দিন খুব অল্প সময় নয়—সেটুকুর মধ্যেই সত্যেন্দ্র-ছানা অনেক-কিছু বিনিময় করলেন, আমি রইলাম সাক্ষী। দু-জনে দু-জনের দিকে তাকান অথবা তাকান না, মেয়েটি পান হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ায়, লাল হ'য়ে ওঠে, চ'লে যাবার সময় আঁচলে একটা ঢেউ খেলে তার—তার শাড়ির নীল রঙের পাড়টিকে আমি লক্ষ করি, যেন বাইরের

সবুজের মধ্যে তা মিশে যাচ্ছে; আমার চোখে পড়ে তার সুন্দর চোখ—তরল ও গভীর ও শান্ত—কিন্তু মাঝে-মাঝে চঞ্চল এক-একটি চাউনি ছুটে আসে, সত্যেন্দ্র যখন কাছাকাছি কোথাও আছেন হয়তো—ছুটে আসতে-আসতে মধ্যপথে মিলিয়ে যায়। যাবার আগে সত্যেন্দ্র মেয়েটির হাতে এনে দিলেন একখানা লাল রঙের সিল্কে-বাঁধাই বই, মলাটের উপর সোনালি অক্ষরে লেখা 'সাবিত্রী-সত্যবান'—আমি বুঝে নিলাম এই উপহারের মধ্যে একটি ইশারা আছে: 'সত্যবান' থেকে 'সত্যেন্দ্র' এক পা মাত্র দূরে।

ট্রেন চলছে, আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি, চুপচাপ। আমি চাটগাঁর কথা ভাবছি না, ছানার কথা ভাবছি না—তাকে ছেড়ে আসার জন্য কষ্ট পাচ্ছি তাও নয়। না—কষ্ট নয়, এক আশ্চর্য সুখ—সুখ নয়, এক নতুন, নামহীন অনুভূতি। আমি শুনছি এক সুর, এক গান—ঝ'রে পড়ছে আকাশ থেকে সুর, আকাশ জুড়ে কারা যেন গান গাইছে—ভেসে আসছে আমার কানে সারাক্ষণ, ট্রেনের চাকার শব্দ ছাপিয়ে, বাইরের সব দৃশ্য মুছে দিয়ে—সারাক্ষণ। চট্টগ্রাম থেকে নোয়াখালি পর্যন্ত সারাটা পথ আমার যেন মোহের মধ্যে কেটে গেলো। সে-ই আমার প্রথম প্রেমে পড়া।

## ১১

কাচারি-ময়দানের মোড় থেকে একটি রাস্তা সোজা দক্ষিণ দিকে চ'লে গিয়েছে—দু-দিকে মস্ত উঁচু ঝাউগাছের সারি

ডালে-ডাল মেলানো, সারাদিন ছায়া কাঁপছে শিরশির, ইংরেজ আমলের চকচকে নতুন টাকার মতো বা লম্বা সোনালি বর্শার মতো রোদ্দুরের সঙ্গে চিকরি-কাটা ছায়ার খেলা চলছে। এই রাস্তারই কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে ডরিক ছাঁদের স্তম্ভ-শোভিত টাউন-হল্, আর তার মুখোমুখি পরিচ্ছন্ন পোস্টাপিশটি—ছুটোই আমার বিশেষ প্রিয় স্থান।

সেই অল্প বয়সেই ডাকবিভাগের সঙ্গে আমার নিবিড় লেনদেন শুরু হয়েছিলো। যেহেতু পারিবারিক চিঠিপত্র আমাকে দিয়েই লেখানো হয়, তাই আত্মীয়রাও বেশির ভাগ চিঠি আমারই নামে পাঠান; মাসে-মাসে আসে অনেকগুলো ছোটো-বড়ো পত্রিকা, দাদামশাই আমাকে কলকাতা থেকে ভি. পি. ডাকে বই আনিয়ে দেন মাঝে-মাঝে, আমি তাঁর সঙ্গে পার্সেল ছাড়াতে গিয়ে ডাকঘরের অন্দরমহলে প্রবেশ করি। সেই থেকে আমি এমন ধারণাও পোষণ করেছিলাম যে সেখানে সব ভালো-ভালো বই কিনতে পাওয়া যায়, আর এই ভুল ভেঙে যাবার পরেও আমার পোস্টাপিশ-প্রীতি ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং আরো বেড়েই গিয়েছিলো, কেননা ততদিনে আমি দিগ্বিদিকে লেখা পাঠাতে শুরু করেছি — অনবরত ফেরৎ আসছে সেগুলো, আর বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো এক-আধটা কখনো ছাপা হচ্ছে না তাও নয়। সকাল থেকেই ডাকের আশায় আমি আনচান, কিন্তু একবার আমাদের এমন এক হরকরা জুটলো যার নাম 'সাধু' হ'লেও কর্তব্য-পালনে তেমন নিষ্ঠা নেই। আধ-বুড়ো অলস প্রকৃতির মানুষ—

পোস্টাপিশ থেকে ব্যাগ ভর্তি ক'রে নিয়ে সে তার বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করে অনেকক্ষণ, তামাক টানে, হয়তো একটু ঝিমিয়েও নেয়, অবশেষে কাজে বেরিয়ে পথ চলে মৃদুমন্দ তালে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গালগল্প করে মাঝে-মাঝে, বেলা এগারোটার আগে আমাদের দোরে তার পায়ের ধুলো পড়ে না। আমি এক-একদিন সটান তার ঘরের মধ্যে গিয়ে হানা দিই : 'সাধুচরণ, আমাদের কোনো চিঠি আছে?' সে হুঁকোয় দুটো টান দিয়ে আধ-বোজা চোখে জবাব দেয়, 'বাড়ি যান, কত্তা, আমি এই এখনই আইতেছি—' অর্থাৎ চিঠি খোঁজার জন্যও গা-টুকু এখন নাড়তে রাজি নয়। অগত্যা আমি ডাকঘরের জানলায় হাজিরা দিতে শুরু করলাম—নিয়ম ক'রে রোজ সকালে সাতটা নাগাদ—সরকারি তকমা-আঁটা চাপরাশিদের মধ্যে মিশে গিয়ে আমার কিছুক্ষণ সময় কাটে চমৎকার। এখানে আমার খুশির উপাদান অনেক—চুনকাম-করা নির্মল দেয়াল, টকটকে লাল পাতের উপরে উজ্জ্বল শাদা অক্ষরে আঁকা নোটিস-গুলো—যার উপর আমার জিভ ছোঁওয়াতে ইচ্ছে করে; দেয়ালে-আঁটা হাঁ-ক'রে-থাকা ডাকবাক্স—যার তলায় চিঠি যাবার জন্য অগুনতি সুরঙ্গ আছে ব'লে এই সেদিনও আমার ধারণা ছিলো—আর ভিতরে কত ক্রিয়াকর্ম, চিঠিতে ছাপ দেবার দুমদুম শব্দ, সর্টারবাবুর হাতের দক্ষতা, গালার গন্ধ, তুঁত-মেশানো ময়দার আঠার গন্ধ, রাশি-রাশি কাগজপত্রের কেমন একটা থমথমে ভোঁতা জমাট গন্ধ, আর ক্যাম্বিসের বস্তা থেকে উগরে-বেরোনো চিঠির স্তূপ—নানা রঙের নানা ছাঁদের

এনভেলাপ, ছোটো-বড়ো নানা রকম পার্সেল, আর কেমন মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে সেগুলির সিজিলমিছিল হ'য়ে যায়—এই সবই আশ্চর্য ব'লে মনে হয় আমার, পুরো ব্যাপারটাই রহস্যময়। আমাকে প্রায় একদিনও খালি হাতে ফিরতে হয় না, কিন্তু চিঠি পাওয়া যেমন সুখের, আমার পক্ষে সেই অপেক্ষার সময়টুকুও তেমনি।

এই সূত্রেই একটি মুসলমান যুবকের সঙ্গে আমার একবার বন্ধুতা হয়—পোস্টাপিশে নিচু দরের চাকুরে সে, লেখাপড়া বেশি শেখেনি, কিন্তু অন্তঃকরণ ভারি সরল ও স্নেহশীল। একদিন তার সঙ্গে হেঁটে-হেঁটে আমি তার গ্রামের বাড়ি পর্যন্ত চ'লে গিয়েছিলাম—চারদিকে গাছপালার ভিড়, হালকা গোলাপি আভা ছড়িয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—সে কিছু খেতে দিয়েছিলো আমাকে, বোধহয় তালশাঁস বা ডাবের শাঁস বা কালোজাম—জিনিশটা ঠিক কী তা বলতে পারছি না, শুধু তার আতিথ্যের ভঙ্গিটা আমার মনে আছে।

## ১২

ইতিমধ্যে আরো একবার বাসা-বদল করেছি আমরা, ডেলনি-হাউস ছেড়ে উঠে এসেছি শহরের মধ্যে দশাচল একটা বাড়িতে, আমাদের সসন্তান আত্মীয়ারা যে যার গৃহে ফিরে গেছেন। এ-রকম সময়ে আমি কিছুদিন সরস্বতী ঠাকরুনকে নিয়ে মেতেছিলাম—সেটাও বোধহয় দাদামশায়েরই মস্তিষ্ক-ঢেউ।

শীতের শেষে আমি আমার বিবিধ চাকুরে আত্মীয়দের নামে-নামে পোস্টকার্ড পাঠাই ; উত্তরে আসে এক-টাকা দু-টাকা মনি-অর্ডার। এটা আমার সরস্বতী পুজোর জন্য চাঁদা। অনেক আগে থেকেই আমি উত্তেজিত, প্রতিমার ফরমাশ আমিই দিয়ে এসেছি, মাঝে-মাঝে গিয়ে দেখেও আসি কতদূর এগোলো—আর তারপর সেই শুভদিনের প্রত্যূষে দাদামশাই আমাকে রাত থাকতে ডেকে দেন, এক পেয়ালা চা খাইয়ে দেন দিদিমা (তাতে নাকি উপোশের গুণ নষ্ট হয় না!)—তারপব দুপুর পর্যন্ত আনন্দ অবিরাম। শীতে কাঁপতে-কাঁপতে স্নান—বোধহয় হলুদ আর নিমপাতা-বাটা গায়ে মেখে—প্রতিমা নিয়ে আসা, আমার নতুন পাওয়া সমবয়সী কয়েকটি বন্ধুর উৎসাহ, পুজোর খুঁটিনাটি আয়োজন যা আমাদের বাড়ির বৃদ্ধা বিধবাটি ক'রে দেন—সবই আমার মনে হয় বিশেষ-কিছু, প্রতি মুহূর্তে আমি অনুভব করি আজকের দিনটি অন্য কোনো দিনের মতো নয়। আমি সাজিয়ে রেখেছি প্রতিমার পায়ের কাছে—স্তূপীকৃত গাঁদাফুল আর খইয়ের মোয়ার ফাঁকে-ফাঁকে—আমার সব পড়ার বই, লেখার খাতা, দোয়াত কলম পেন্সিল ; পুরুৎঠাকুর এসেছেন, আমি তাঁর মুখে-মুখে অন্যদের সঙ্গে সমস্বরে আওড়াচ্ছি—'টং টং সরস্বতী নির্মলবর্ণে / রত্নে বিভূষিতা কুণ্ডল কর্ণে'—তখন অবশ্য আমি জানি না যে পুরুৎটি এত অশিক্ষিত যে 'ত্বম্' শব্দকে টংকারে পরিণত ক'রে নিয়েছেন ; বুঝি না যে এই তথাকথিত পুরোহিত ও তথাকথিত মন্ত্রের লেখক সরস্বতীর ধারে-কাছে ঘেঁষার যোগ্য নন ;—

আমার মনের সুখবোধ তাই ভরপুর থেকে যায়। অঞ্জলিদান, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম, খইয়ের মোয়া খেয়ে উপবাস-ভঙ্গ—এই সব অনুষ্ঠানের শেষে মধ্যাহ্ন-ভোজন পরিবেষিত হয়: শুধু হলুদ দিয়ে রাঁধা নতুন ইলিশের পাৎলা ঝোল রসনা থেকে হৃদয় পর্যন্ত পুলকের সঞ্চার করে—মনে হয় যেন অপূর্ব এক আস্বাদ, কেননা তখনকার দিনে হেমন্তে শীতে ইলিশভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিলো—বোধহয় বাজারেও বেশি উঠতো না—বাৎসরিক ইলিশ-উৎসবের তারিখও ছিলো শ্রীপঞ্চমী।

কিন্তু আমি আমার সরস্বতী পুজোকে সেখানেই শেষ হ'তে দিই না। প্রতিমাটিকে বিসর্জন না-দিয়ে তুলে রাখি বারান্দায় তাকের উপর, সেখানেই আমার নিত্যকর্ম নিয়ে ব্যাপৃত থাকি কোনো-কোনো দিন। আমার মনের ভাবটি অবশ্য এই যে মূর্ত বাগ্দেবীর পায়ের তলায় ব'সে লেখাপড়া করলে আমি আরো দ্রুত বিদ্বান হ'তে পারবো।

এই সময়কার অন্য একটি ঘটনা না-বললে আমার ছেলে-বেলার কথা সম্পূর্ণ হবে না।

সুকুমার রায়ের মৃত্যু হয়েছে, 'সন্দেশ' আর বেরোচ্ছে না। ততদিনে আমি যদিও 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' ইত্যাদি নিয়ে মাতোয়ারা, তবু 'সন্দেশে'র ফাঁক ভরানো সহজ হ'তো না আমার পক্ষে, যদি না 'মৌচাক' আসতো নতুন মধুর গন্ধে ভরপুর। 'ঝরছে রে মৌচাকের মধু,/গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ায়'—এই দিয়ে প্রথম সংখ্যাটির আরম্ভ, তার পরেই গুনগুন ভোমরার

মতো একটা গল্প লেখা : 'রিদয় নামে ছেলেটা নামেই হৃদয়, দয়ামায়া তার একটুও ছিলো না', আর তারপর আরো অনেক গল্প কবিতা পেরিয়ে শেষ পাতায় একটি ধাঁধা—'তিনটি হরফে নাম, শক্ত জবাব,/চিনতো তাদের শুধু বাদশা নবাব'—জবাব শক্ত নয়, কিন্তু পদ্য ভালো :—সব মিলিয়ে নানান রসে সুস্বাদু। মাস-পয়লায় আমি তেমনি আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকি 'মৌচাকে'র জন্য, যেমন থাকতাম 'সন্দেশে'র আশায় — কিন্তু আমারই দোষে 'মৌচাকে'র সঙ্গে আমার সম্পর্কটি বিশুদ্ধ আনন্দের হ'লো না।

'সন্দেশে'র আমি ছিলাম নিছক ভোক্তা, তার কারিগরদের লিস্টিতে ঢুকবো এমন কল্পনা কখনোই করিনি, কিন্তু — যেহেতু ততদিনে আমি নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখে ফেলেছি, আমার বয়সও একটু বেড়েছে — তাই 'মৌচাকে' লেখা ছাপাবার এক অদম্য ইচ্ছে আমাকে পেয়ে বসলো। আমি ছুঁড়ছি তীরের পর তীর—অনবরত — কিন্তু সবগুলোই সম্পাদকের দপ্তরে ঠোকর খেয়ে অবিলম্বে আমারই গায়ে এসে বিঁধছে। অবশেষে একদিন লম্বা একখানা চিঠি লিখে পাঠালাম সম্পাদকমশাইকে—তিনি 'পক্ষপাতদোষে দুষ্ট', 'দলের লোকের বাইরে' লেখা নেন না, এমনি নানারকম অভিযোগ ক'রে, যা চিরকাল দুর্বলের মুখে শোনা গিয়েছে। বলতে দোষ নেই, চিঠিখানা আমি ঠিক নিজের বুদ্ধিতে লিখিনি, লিখেছিলাম আমার বিষয়ে স্নেহান্ধ দাদামশাইয়ের নির্দেশমতো, যদিও — সন্দেহ নেই—আমারই বিক্ষোভ দেখে তিনি মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছিলেন।

'মৌচাকে'র পরের সংখ্যার সম্পাদকীয়তে সেই চিঠির তীব্র নিন্দা বেরোলো, প্রায় আস্ত একটা পৃষ্ঠা জুড়ে, পত্রলেখকের নামটি অবশ্য উহ্য রেখে। আমি মাথা পেতে নিলাম সেই শাস্তি, কাজটা খুব অন্যায় হয়েছিলো তা বুঝে নিতে আমার দেরি হ'লো না। তেমনি রইলাম 'মৌচাকে'র দ্বারা মুগ্ধ হ'য়ে—যতদিন না, আমার যৌবনের শুরুতে, সেই শিশু-পত্রিকাটি আমার জীবন থেকে খ'সে পড়লো—কিছুকালের মতো।

এই কাহিনীর একটি সুখের উপসংহার আছে। আমার সাহিত্যিক জীবনে যে-ক'টি মানুষকে আমি সত্যিকার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু হিশেবে পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সুধীরচন্দ্র সরকার—সেই সম্পাদকমশাই, যিনি আমার ছেলে-বেলার অশিষ্টতাকে সুযোগ্যভাবে শাসন করেছিলেন। আমার কুড়ি বছর বয়স থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার প্রীতির সম্বন্ধ অটুট ছিলো।

## ১৩

ডরিক-স্তম্ভযুক্ত টাউন-হল্‌টি ছিলো নোয়াখালির সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, প্রমোদভবন। দক্ষিণের ঘরে বিলিয়ার্ডস, তাসের টেবিল, অন্য দিকে লাইব্রেরি। মাঝের মস্ত হল্‌ঘরটির দেয়াল ঘেঁষে, বুক-সমান উঁচু ডেস্কের উপর প'ড়ে থাকে সাপ্তাহিক বা অর্ধ-সাপ্তাহিক 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী' ইত্যাদি—এক-একটার কাগজ এত বড়ো মাপের যে পত্রিকাটি বিছিয়ে একজন সাবালক মানুষ শুয়ে থাকতে পারে। অনেকগুলো দৃশ্যপট-সমেত একটি পাকা

স্টেজও আছে, হল্‌ঘরটি অডিটোরিয়ামের কাজ করে, মেয়েদের বসার ব্যবস্থা দেড় তলায়। স্থানীয় কয়েকটি যুবক কলকাতায় কলেজে পড়েন, ছুটির সময়ে বাড়ি এসে নাটক নিয়ে মেতে ওঠেন তাঁরা, চাকুরেদের মধ্যেও কেউ-কেউ উৎসাহী। শহরের সব ভদ্রলোক ও অনেক ভদ্রমহিলার পক্ষে এই নাট্যাভিনয়গুলি এক প্রধান অনুষ্ঠান—আর আমার পক্ষে, প্রায় অলৌকিক এক ঘটনা।

কনসার্ট চলছে তখনও, পর্দা ওঠেনি, আমি মুগ্ধ চোখে ড্রপ-সীনটির দিকে তাকিয়ে আছি। উঁচু-নিচু পাহাড়ের সারি, ধাপে-ধাপে ঘন-সবুজ গাছ—তারই তলায় বেঁকে গিয়েছে রেল-লাইন, লম্বা একটি ট্রেন চলেছে। পাশে নদী, নদীতে এক দোতলা স্টিমার, জলের মধ্যে আবির-গোলা রং ছড়িয়ে সূর্য উঠছে অথবা অস্ত যাচ্ছে। চিৎপুরের কোনো-এক পটুয়ার আঁকা এই স্থূল দৃশ্যটিকে স্বপ্নের মতো মনে হয় আমার, যেন ঐ স্থানটি একটি ভূস্বর্গ, ঐ ট্রেনে বা স্টিমারে যারা যাত্রী তাদের মতো সুখী মানুষ আর নেই। আর পর্দা ওঠার পর-মুহূর্ত থেকে আরো বিচিত্র এক সম্ভোগে আমি ডুবে যাই—গ্যাসের বাতির উগ্র শাদা আলোয় দেখা মানুষগুলো—আমি চিনি তাঁদের অনেককে, নাম জানি, কথাও বলেছি কারো-কারো সঙ্গে—কিন্তু এখন তাঁরা রূপান্তরিত; তাঁদের পাগড়ি, তাঁদের নাগরা, তাঁদের লম্বা পোশাকে রাংতা-জরির ঝলমলানি, তাঁদের গর্জন আর আস্ফালন আর চোখের ঘূর্ণন নিয়ে তাঁরা কেউ রাজপুত বীর, আর কেউ বা মোগল সেনাপতি। তাঁরা

যখন তলোয়ার চালিয়ে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে যুদ্ধে মাতেন, আমার বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়; দুই নির্বাসিত ভাই বিজয়-বসন্ত যখন করুণ সুরে বিলাপ করতে-করতে উইং দিয়ে বেরিয়ে যায়, আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে তাদের জন্য। তথ্য হিশেবে আমি জানি যে মঞ্চের দু-পাশে আছে সাজঘর—আমি নিজেও গিয়েছি সেখানে, তবু আমি মানতে পারি না যে দুঃখী ভাই দুটি এতক্ষণে এক ঘোর অরণ্যে গিয়ে পড়েনি, যে মঞ্চ থেকে বেরোবার ঐ গলি-পথটি চ'লে যায়নি দূরে-দূরান্তে দেশান্তরে। জানি, এইমাত্র-নিহত ঐ বীর যোদ্ধাটির সঙ্গে কালই আমার দেখা হ'তে পারে রাস্তায়, তবু, তাঁর রক্তাক্ত দেহটির দিকে তাকিয়ে তাঁকে জীবিত ব'লে আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না। এমনি, আমার মনের মধ্যে আবেগের ঢেউ তুলে-তুলে এগিয়ে চলে নাটক; রাত বাড়ে, ঘুমে ঢুলে পড়ে আমার মাথা, আমি চোখ টান ক'রে তাকিয়ে থাকি; পরে কয়েকদিন ধ'রে দৃশ্যগুলির মিছিল চলে আমার মাথার মধ্যে।

শুধু একটি জিনিশ আমার ভালো লাগে না। স্টেজে কোনো স্ত্রী-চরিত্র এলেই বিরক্তি বোধ করি—কেন, তা কিছুদিন পরে বুঝেছিলাম। বলা বাহুল্য, পুরুষেরাই দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সাজতেন, আর বোধহয় শিশুকাল থেকেই নারীর নারীত্ব বিষয়ে আমার অনুভূতি একটু তীক্ষ্ণ ছিলো।

১৪

আমাদের নোয়াখালিবাসের শেষ পর্যায়ে আমার সময়টা তেমন ভালো কাটেনি। আমি আত্মসচেতন হ'য়ে উঠছি, নিজের অনেক প্রকৃতি-দত্ত ত্রুটি আবিষ্কার ক'রে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে আছি মনে-মনে। সমবয়সী অন্য ছেলেদের তুলনায় আমি বেঁটে, আমি রোগা এবং দুর্বল—ফুটবল দূরে থাক, ব্যাডমিণ্টনেও আমার অল্পেই দম ফুরিয়ে যায়। আমার স্বাস্থ্য ভালো নয়—ঘুরে-ঘুরে ভুগি জ্বরে, সর্দিতে, দাঁতব্যথায়, আমাকে গিলতে হয় বিস্বাদ বার্লি, আর তীব্র তেতো কবরেজি পাঁচন—পর-পর দুটো শীত ঋতু ভ'রে চর্মরোগে কুৎসিত কষ্ট পেলাম। তার উপর আমি তোৎলা; হঠাৎ কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমার যন্ত্রণা দুঃসহ হ'য়ে ওঠে, কোনো তর্ক উঠলে আমার চোখা-চোখা যুক্তিগুলোকে কণ্ঠনালী থেকে টেনে বের করার ব্যর্থ চেষ্টায় আমি হাঁপাতে থাকি। কিন্তু, প্রায় একই সময়ে, আমি এও বুঝেছি যে আমার হাতে এ-সব বঞ্চনার একটি উত্তর এসে গিয়েছে—একটি ক্ষতিপূরণের উপায়, হয়তো বা এমন কোনো ক্ষমতা যা সকলের থাকে না। ততদিনে আমি এক-ঝুড়ি-ভর্তি কবিতা আর গল্প প্রবন্ধ লিখে ফেলেছি; 'বিকাশ' অথবা 'পতাকা' নামে একটি হাতে লেখা মাসিকপত্রের আমি সম্পাদক, প্রধান লেখক ও লিপিকার; ঢাকার শিশুপাঠ্য পত্রিকা 'তোষিণী'তে আমার লেখা বেরিয়েছে, আর বর্জইস অক্ষরে কলকাতার 'অর্চনা'য়, এমনকি শ্বেত-পীত মলাটধারী সম্ভ্রান্ত চেহারার 'নারায়ণে'ও। আমার কবিখ্যাতি ছড়িয়ে

পড়েছে সারা নোয়াখালি শহরে, এবং অন্য একটি কারণেও বয়স্করা আমাকে সমাদর করছেন। আমি হঠাৎ একজন অভিনেতা হ'য়ে উঠেছি, এমনকি গ'ড়ে তুলেছি আমার সমবয়সী বা আমার চাইতে অল্প-বড়ো কয়েকটি ছেলেকে জুটিয়ে একটি নিজস্ব নাটুকে দল; কোনো রাজপুরুষের বিদায় অথবা অভ্যর্থনা-সভায় এবং অন্যান্য উপলক্ষেও অভিনয় বা আবৃত্তির জন্য ডাক পড়ে আমাদের—জোড়াতালি-দেয়া তক্তাপোশ-পাতা স্টেজ থেকে সাক্ষাৎ টাউনহল্‌-মঞ্চে প্রোমোশন পেয়েছি আমরা। আশ্চর্যের বিষয়, মঞ্চে নামলে আমার তোৎলামির চিহ্নমাত্র থাকে না—আমাকে সাহায্য করে আমার উৎসাহ, শ্রোতাদের প্রীতি, আর সবচেয়ে বেশি কবিতার ছন্দ। আমাদের রেপেরতোয়ারে এমন-কোনো পালা নেই যা পদ্যে লেখা নয়—'মেঘনাদবধ কাব্য' আর নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র' থেকে সংকলিত কোনো-কোনো দৃশ্য আমাদের বিশেষ প্রিয়—স্থানীয় এলিটবৃন্দও সেগুলির তারিফ ক'রে থাকেন। দূরস্থ আত্মীয়দের কাছেও প্রশংসা পাই—বিশেষত কোনো বিয়ের সময়, যখন আমি তাঁদের ফরমাশ-মাফিক পরিণয়-পদ্য বানিয়ে ফেলি বিদ্যুৎবেগে—রঙিন ফুলের পাড়-বসানো পাৎলা ফুরফুরে জাপানি কাগজে লাল অথবা সোনালি অথবা বেগনি রঙে ছাপা হ'য়ে বিয়ের আসরে বিলোনো হয় সেগুলো। আত্মীয়েরা, নোয়াখালির বিশিষ্ট নাগরিকেরা, সকলেই একটু বিশেষ চোখে দ্যাখেন আমাকে, যে-সব বই উপহার দেন তার মধ্যে থাকে এক-ভল্যুমে সমগ্র শেক্সপীয়র, এমনকি

বাল্মীকি-রামায়ণ পর্যন্ত। এমন নয় আমার জীবনের কাছে খুশি হবার মতো আমি কিছুই পাচ্ছি না।

কিন্তু আমার এই ছোটো-ছোটো সাফল্যগুলোয় আমার ঠিক মন উঠছে না। আমি যা, আমি তার চেয়ে বড়ো, ভালো, যোগ্য হ'তে চাই—কবে, কতদিনে, কেমন ক'রে তা হ'তে পারবো আমি ভেবে পাই না। অতৃপ্তি আমাকে পীড়ন করে মাঝে-মাঝে—নিজের বিষয়ে, এবং আমি যেখানে এবং যে-ভাবে আছি সে-সব নিয়েও অতৃপ্তি। আমি পড়ছি জুল ভের্ন, 'সুইস ফ্যামিলি রবিন্সন', ভিক্তর উগোর উপন্যাস—আমার মন ঘুরে বেড়ায় দূর দেশে, নীলতর অন্য সব আকাশের তলায়—পর্বতে, অরণ্যে, সমুদ্রে,—ভাসে গন্দোলায় চাঁদের আলোয় সন্ধেবেলা, অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামে কোনো নতুন শহরে ক্যাথিড্রেল-পাড়ায় সরাইখানায়। কিন্তু স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন এগুলো—যেখানে আছি সেখানে বাঁশবনে সন্ধ্যা নামে ঝামরে, মশাদের কোরাস বাজে উঁচু পর্দায়, সবুজ পুকুরে কচুরিপানা আরো এগিয়ে আসে, আর পাশের বাড়িতে এক পুলিশ-ইন্সপেক্টর তাঁর ভাইপোকে হাণ্টার দিয়ে পেটাতে থাকেন—প্রায় নিয়ম ক'রে। ছেলেটা যণ্ডাগোছের, আমি তাকে একটুও ভালোবাসি না, কিন্তু তার আর্তনাদ যেন গাঢ়তর এক কালিমা ছড়িয়ে দেয় হাওয়ায়, আমি উঠে গিয়ে লণ্ঠনের আলোয় আবার কোনো বই খুলে বসি—হয়তো সেই বইটার নাম 'চয়নিকা'।

এক শীতের সকালে—আমরা তখন ঢাকায় বেড়াতে গিয়েছি—আমার এক আত্মীয় ঘরে ঢুকে আমাকে বললেন, 'এই যে, তোমার বই।' গলাবন্ধ কোটের পকেট থেকে বের ক'রে দিলেন এক কপি 'চয়নিকা'। ডবল-ক্রাউন ষোলো-পেজি আকার, ইণ্ডিয়ান প্রেসে পাইকা অক্ষরে ছাপা ; লেখক—'শ্রী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদকের নাম 'শ্রী' চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বই হাতে পাবার পর আমি হারিয়ে ফেললাম হেম নবীন মধুসূদনকে, এর আগে যত বয়স্কপাঠ্য বাংলা কবিতা আমি পড়েছিলাম, তার অধিকাংশ আমার মন থেকে ঝ'রে প'ড়ে গেলো। এখনো, অর্ধশতাব্দী পরেও, আমি যখনই ভাবি রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো লাইন—'ধন্য তোমারে, হে রাজমন্ত্রী,/চরণপদ্মে নমস্কার', বা 'হাজার-হাজার বছর কেটেছে কেহ তো কহেনি কথা', বা 'আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ', বা 'ঐ শোনো গো অতিথ বুঝি আজ/এলো আজ—' তখনই আমার চোখে ভেসে ওঠে সেই ডবল-ক্রাউন ষোলো-পেজি সাইজের পৃষ্ঠা, সেই পাইকা অক্ষর—নিখুঁত একটি ফোটোস্টাট কপি যেন—অথবা, আরো অবিকল—পৃষ্ঠাটি ডাইনের না বাঁয়ের তা পর্যন্ত আমি ভুলিনি। পরবর্তী ভোট-কুড়োনো পরিস্ফীত 'চয়নিকা' বা এখনকার চলতি বই 'সঞ্চয়িতা', এগুলোকে আমি কখনোই ভালোবাসতে পারিনি—এদের আকার, মুদ্রণ, পঙক্তিসজ্জা, স্তবকবিন্যাস,

কিছুই আমার পছন্দ হয় না, এই একটি বিষয়ে বর্তমানের উপর আমার অতীতকাল জয়ী হ'য়ে আছে।

কিন্তু 'চয়নিকা' চোখে দেখার আগেই রবীন্দ্রনাথে আমার প্রবেশিকা ঘটে। আর, খুব সম্ভব, প্রথম অভিঘাত বই পড়ারও নয়, কানে শোনার। একবার গিয়েছিলাম নোয়াখালির মেয়েদের স্কুলের পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠানে, দাদামশায়ের সঙ্গে। একটি বেশ বড়োশড়ো মেয়ে (অন্তত আমার চোখে তা-ই) সাধারণ শাড়ি-জামা প'রে এসে দাঁড়ালো, দর্শকদের নমস্কার ক'রে যে-কবিতাটা বললো তার প্রথম লাইন 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে/জাগো রে ধীরে।' তারপর চার-পাঁচটি মেয়ে সেজে-গুজে এসে অভিনয় করলো মিনিট দশেকের একটা নাটক। শ্রাবস্তীপুরে দুর্ভিক্ষ লেগেছে, ধনীর গৃহেও অন্ন নেই, কেউ কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না—শুধু একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো সে সকলকে অন্নদান করবে। আমার কানে লেগে রইলো সেই আবৃত্তি, সেই রচনা, 'জয়সেন' ও 'করিছেন' শব্দের অসাধারণ মিল, 'চিত্ত', 'তীর্থ', 'নিত্য' প্রভৃতি সমস্বর শব্দের অনুরণন—মেয়েদের বলা ছন্দ, ভাষা, অনুপ্রাস আমার মনে এক নতুন ও অদ্ভুত স্বাদ ছড়িয়ে দিলো। আমি অস্পষ্টভাবে অনুভব করলাম যে 'কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি! / মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে' ইত্যাদি লাইনগুলো প'ড়ে, শুনে, বা নিজে আবৃত্তি ক'রে, ঠিক এ-রকম সুখ আমি কখনো পাইনি।

এই মেয়েদের স্কুলের ঘটনাটুকু কোন সময়কার, তখন আমরা

কোন বাড়িতে আছি, সে-সব কিছুই আমার মনে নেই। এমনও হ'তে পারে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাও আমি পড়িনি তখনও, অথবা লেখকের নাম লক্ষ ক'রে পড়িনি, কিন্তু কোনো-এক সময়ে—বেশিদিন পরেও হয়তো নয়—আমার বয়স বোধহয় তখন এগারো চলছে—'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামটি আমার কাছে স্পষ্ট এবং প্রিয় হ'য়ে উঠলো।

আমার নামে যে-সব পত্রিকা আসে, তার মধ্যে আমাকে সবচেয়ে আনন্দ দেয় 'প্রবাসী', কেননা সেখানে প্রতি মাসে বেরোয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা, আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নামে আর-একজনেরও—কখনো-কখনো একই সংখ্যায় চার-পাঁচটি ক'রে। নোয়াখালিতে বেড়াতে এলেন কলকাতার একটি ভদ্রলোক, শোনা গেলো কোনো মাসিকপত্রের তিনি সব-এডিটর বা ম্যানেজার বা অন্য কিছু—দাদামশাই ব্যস্ত হ'য়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে এলেন বাড়িতে, আমার কারণে সাহিত্যের ছিটেফোঁটা সংস্রবও তাঁর কাম্য হ'য়ে উঠেছে। এই অতিথির মুখেই আমি প্রথম শুনেছিলাম 'রবিবাবু'র গান—হার্মোনিয়ম বাজিয়ে অনেকগুলো গেয়েছিলেন তিনি—যতদূর মনে পড়ে, তাঁর গাওয়াতে তেমন মাধুর্য ছিলো না, কিন্তু আমি সুরের চাইতে অনেক বেশি শুনছিলাম কথাগুলো। কয়েকটা গান আমার আগেকার চেনা; 'চয়নিকা'র আগেই 'গীতাঞ্জলি' আমি হাতে পেয়েছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য বই আমি প্রথম পড়ি 'ডাকঘর' আর 'ছিন্নপত্র'—দুটোই টাউন-হল্ লাইব্রেরি থেকে ধার ক'রে।

'ডাকঘরে'র দৃশ্যপট আমাকে বেশ ভাবিয়েছিলো, মনে পড়ে : নীল পাহাড়, লাল রঙের রাস্তা, ঝর্নার জল—এ-সব আমার কল্পনায় থাকলেও চোখের পক্ষে অচেনা ছিলো, যতদিন না, আমার পনেরো বছর বয়সে, দাদামশায়ের চিকিৎসার কারণে আমাকে কিছুদিন রাঁচিতে কাটাতে হয়েছিলো। তিন বছর পরে প্রথম দেখলাম শান্তিনিকেতন—দেখামাত্র 'ডাকঘর' মনে প'ড়ে গেলো। কিন্তু 'ছিন্নপত্রে'র ভূগোল শনাক্ত করতে আমার একটা দিনও দেরি হয়নি—তার সঙ্গে দৈবের একটি যোগাযোগ ঘটে গিয়েছিলো।

কুমিল্লা জেলার এক গ্রামে যাচ্ছি দাদামশায়ের সঙ্গে—উপলক্ষ : এক মাসির বিয়ে। যাচ্ছি নৌকোতে, সারাটা পথ নৌকোতে, পুরো একটা দিন কেটে গেলো জলের উপর। আমি সঙ্গে নিয়েছি 'ছিন্নপত্র'—মোটা অ্যান্টিকে ছাপা কালো চামড়ায় বাঁধানো বই—বইটার মধ্যেই ডুবে আছি। হাউস-বোট নয়—গোল-ছইওলা অতি সাধারণ দিশি নৌকোয় চলেছি আমরা, পদ্মা আত্রাই ইছামতীর বদলে সরু-সরু-খালের মধ্য দিয়ে—আমাদের দু-পাশে বনজঙ্গল ঘন, কোথাও-কোথাও দিনের আলোতেও প্রায় অন্ধকার, কোথাও-কোথাও বৈঠা রেখে দিয়ে লগি ঠেলতে হচ্ছে মাল্লাকে, জল থেকে একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ উঠছে, দৃশ্য বলতে উলঙ্গ শিশু আর বাসন-ধুতে-আসা বৌ-ঝিরা ছাড়া আর-কিছু নেই। কিন্তু আমি যেন সেই সব দৃশ্য দেখতে-দেখতেই চলেছি, 'ছিন্নপত্রে' যেগুলোর কথা লেখা আছে—সেই জ্যোছনা, রোদ্দুরে ঝলকে-ওঠা নদীর স্রোত, সেই

শান্ত বালুচর, অবাধ নির্জনতা। বিয়ে-বাড়িতে দিন দুয়েক মাত্র কাটিয়ে আমরা সেই নৌকোতেই ফিরে এলাম, বাড়ি এসে আমার কেবলই মনে হ'তে লাগলো আমার সারা শরীর টলছে—বুঝতে পারলাম না সে কি নৌকোর দুলুনির জন্য, না কি বইটা আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো বই, যা ছেলেবেলায় ঝড়ের মতো ব'য়ে গিয়েছিলো আমার উপর দিয়ে—যেমন 'গোরা', 'বলাকা', কয়েক বছর পরে 'পূরবী'—তা এখন আর তেমন নাড়া দেয় না আমাকে ; কিন্তু সেই নৌকোতে-পড়া বইটি আমার কাছে এখনো প্রথম দিনের মতোই তরতাজা। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-বইয়ের মধ্যে আমি জীবন ভ'রে সবচেয়ে বেশি বার পড়েছি 'ছিন্নপত্র', আমার প্রথম বিদেশভ্রমণের সময় আমি ওটি অতি যত্নে সর্বদা সঙ্গে রেখেছিলাম—বারো হাজার মাইল দূরে ব'সে মাঝে-মাঝে বাংলাদেশের হৃদয়ের স্পর্শ পাবার জন্য। আজ পর্যন্ত, কোনো কারণে পাতা ওল্টাতে হ'লে—হাতে যতই না কাজ থাক সে-মুহূর্তে—বেদরকারে দু-চার পৃষ্ঠা প'ড়ে ফেলার লোভ আমি সামলাতে পারি না।

এখানে আমার অন্য একটি নৌকাভ্রমণ স্মরণীয়।

১৬

আমার দাদামশায়ের দেশ বহর গ্রামে আমরা সাধারণত যাই পুজোর সময়, দিন দশ-বারো কাটিয়ে ফিরে আসি; কিন্তু সেবারে—কী কারণে আমার মনে নেই—আমরা একটানা মাস দুয়েক ছিলাম। পাশের গ্রাম তেলিরবাগ কলকাতার বিখ্যাত দাশবংশের আদিবাসভূমি; আমরা রটনা শুনলাম চিত্তরঞ্জন আসছেন তাঁর পৈতৃক ভিটে চোখে দেখার জন্য। তখন তিনি ব্যারিস্টারি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, হ'য়ে উঠেছেন সারা বাংলার নয়নের মণি—কিন্তু তখন পর্যন্ত 'দেশবন্ধু' উপাধিটি অর্পিত হয়নি তাঁর উপর, বাঙালিরা তাঁকে তখনও বলে সি. আর. দাশ—কেউ-কেউ দাশ-সাহেব।

সত্যি একদিন তেলিরবাগে এসে পৌঁছলেন চিত্তরঞ্জন—সপরিবারে। দাদামশাই উদ্যোগী হলেন তাঁর বালক-দৌহিত্রটিকে সেই যশস্বী পুরুষের কাছে উপস্থিত করার জন্য—তিনি লোকনায়ক ব'লে নয়, তিনি কবি ব'লেই। আমি জানি না সেটি কেমন ক'রে ঘটানো হয়েছিলো—কিন্তু একদিন আমি তাঁর গৃহে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রিত হলাম। যেতে হ'লো নৌকোতে, ভরা ভাদর বা শরতের আরম্ভ তখন—চারদিকে থৈ-থৈ জল। একটি হলদে রঙের দোতলা বাড়ির ঘাটে নৌকো বাঁধা হ'লো, আমি দুরুদুরু বুকে ডাঙায় নামলাম।

দক্ষিণ-মুখো দোতলার বারান্দায় তিনটি মহিলা ব'সে আছেন—

কেউ চেয়ারে, কেউ আলসেতে হেলান দিয়ে তকতকে মেঝের উপর। ফ্যাকাশে রঙের পাড়ওলা শাদা খদ্দরের শাড়ি তাঁদের পরনে ; তাঁদের মুখ, চোখ, নড়াচড়ার ভঙ্গি, কথা বলার ধরন— সবই আমার মনে হ'লো আশ্চর্য, অসাধারণ। ফাউন্টেন-পেন দিয়ে চিঠি লিখছেন তাঁরা, হাতের কাছে অনেকগুলো কাগজ লেফাফা ছড়ানো। শুভ্র চাদরে জড়ানো দীর্ঘকায় চিত্তরঞ্জন কয়েক মুহূর্তের জন্য সেখানে এসে দাঁড়ালেন, উল্টে-পাল্টে দেখলেন আমার কবিতার খাতা, বিশেষ কিছু না-ব'লে চ'লে গেলেন। তারপর মহিলাদের সঙ্গে টেবিলে ব'সে ভোজন, ভোজনের পরে নৌকোয় ক'রে বাড়ি ফেরা। এই পর্যন্ত।

সেদিন বাসন্তী দেবী, বা তাঁর দুই কন্যা, অথবা উপস্থিত অন্য কেউ আমাকে কী-কথা বলেছিলেন, আমিই বা কী উত্তর দিয়েছিলাম, খাবার থালায় কোন-কোন দ্রব্য পরিবেষিত হয়েছিলো, সেই সবই আমার বিস্মরণে তলিয়ে গেছে। ভুলিনি শুধু একটি লাইন, যেটি তাঁদের চিঠির কাগজের মাথায় ছাপানো ছিলো—'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্'— মহিলাদের মধ্যে কোনো-একজন আমাকে পুরো শ্লোকটি শুনিয়েছিলেন, বিশুদ্ধ সংস্কৃত ধরনে, স্বরের হ্রস্বতা ও দৈর্ঘ্যকে উচ্চারণে পরিস্ফুট ক'রে। তাঁরা আমাকে এও বলেছিলেন যে বোধিবৃক্ষের তলায় তপস্যায় বসার পূর্ব মুহূর্তে এই শ্লোকটি শাক্যমুনির মুখ থেকে বেরিয়েছিলো—'ইহা—সনে শুষ্যতু মে শরী—রম্।—এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হোক।' লাইনটি আমি অন্য কোথাও উদ্ধৃত দেখিনি, এখনো কোনো

গ্রন্থেও পড়িনি—এর উৎস কী, আমি তা জানি না* ; —কিন্তু সময়ের তরঙ্গ থেকে যে-ক'টি মুক্তো আমার হাতে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে আবার সেই মহাসমুদ্রেই ফিরে যায়নি—যে-ক'টি অজর অক্ষর কবিতার লাইন আমার মনের মহার্ঘতম সঞ্চয়—তার মধ্যে এটিও একটি।

তেলিরবাগ ছেড়ে চ'লে যাবার দিন দাশ-পরিবার আবার আমাকে স্মরণ করলেন।

বিক্রমপুরের ভূগোল বরিশাল জেলারই মতো ; এক-মাইল-পরিমাণ রেল-পথও নেই, ভ্রমণের একমাত্র উপায় জলযান। গ্রাম থেকে বেরোতে হয় নৌকোয়, স্টিমার পাওয়া যায়

* এই বাক্যটি লেখার কয়েক সপ্তাহ পরে আমি ছাপার অক্ষরে পুরো শ্লোকটির দেখা পেয়ে যাই—এখানে সেটি উদ্ধৃত করছি :

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মেতৎ চলিষ্যতি॥

—'এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হোক, ধ্বংস হোক ত্বক, অস্থি, মাংস ; [ যতদিন ] বহুকল্পদুর্লভ জ্ঞান অপ্রাপ্ত থাকবে [ ততদিন ] এই আসন থেকে দেহ সঞ্চালিত হবে না।'

আমার দৃষ্ট পুস্তকটি হ'লো রাধাকৃষ্ণণ সম্পাদিত ধম্মপদ, মূল উৎস ললিতবিস্তর'।

বইয়ের প্রেস-কপি যখন তৈরি করছি, এক বন্ধু আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে অবনীন্দ্রনাথের 'নালক'-এও এই শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

লোহজং বন্দরে। তাঁরা চলেছেন একটি আসবাবসম্পন্ন হাউস-বোটে—বাসন্তী দেবী, তাঁর দুই কন্যা অপর্ণা ও কল্যাণী, চিত্তরঞ্জন ছিলেন না—ছিলেন একটি যুবক, খুব সম্ভব হেমন্ত সরকার। আমাকেও তাঁরা কিছুটা পথ সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের বাড়ির নৌকো পিছন-পিছন আসছে।

রুপোলি পদ্মার উপর দিয়ে তীর ঘেঁষে চলেছে হাউস-বোট। সকালবেলাটি উজ্জ্বল ও রৌদ্রময়, তীরে-তীরে পল্লীর মুখ প্রফুল্ল। বোটের গতি মন্থর, আন্দোলন ক্ষীণ, বসার ব্যবস্থা সুখদায়ক—জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। হেমন্ত সরকারের অনুরোধে কল্যাণী আবৃত্তি করলেন 'সোনার তরী' কবিতাটা—তাঁর কণ্ঠে লাইনগুলোর মাধুর্য যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে বাসন্তী দেবী কামরার বাইরে এসে দাঁড়ালেন, তীরভূমির দৃশ্য দেখতে-দেখতে ব'লে উঠলেন — 'নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি !/ গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি — ' এই লাইন দুটো হাতে-হাতে ঘুরে চিটচিটে হ'য়ে যায়নি তখনও, টাকশাল থেকে টাটকা বেরিয়েছে, আর আমারও তখন বয়সটা ছিলো সবুজ। আমি শুনলাম মন দিয়ে প্রতিটি কথা — টেনে-টেনে পুরো স্তবকটি বললেন বাসন্তী দেবী, মৃদু হাওয়ায় আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেলো তাঁর কণ্ঠস্বর, জলের ছলছল-শব্দ আবার স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। অনেক-কিছু উপহার নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম সেদিন, কিন্তু কাউকে তা দেখানো গেলো না, বলা গেলো না আমি কী উপহার পেয়েছি।

## ১৭

নোয়াখালি থেকে বার-বার বছরে আর মাঝে-মাঝে ঢাকায় যাওয়া-আসার জন্য পূর্ববাংলার জলপথের সঙ্গে আমার খুব চেনাশোনা হ'য়ে গিয়েছিলো—এখানে তার উল্লেখ অবান্তর হবে না।

সন্ধেবেলা যাবার ট্রেন ছাড়ে, দুপুর-রাতে দিদিমা আমাকে ঠেলে তোলেন, আমার ঘুমে-ভরা ঝাপসা চোখে দেয়ালি জ্বেলে দেয় লাকশাম জংশনের গ্যাসের বাতিগুলো। অন্য ট্রেন, চাঁদপুরে ভোর—নদী—নোয়াখালির নদীর মতো অবন্ধু নয়, বন্দরের ব্যস্ততায় সজীব। টাটকা হাওয়ায় জেটির দিকে হাঁটছি আমরা—জলের উপরে কাঁচা রোদের ঝলক, কুমিরের মতো কালো এবং হাঁ-ক'রে-থাকা ফ্ল্যাটগুলো, একটু দূরে দাঁড়ানো তিনটে-চারটে স্টিমারের মধ্যে কোনটা আজ আমাদের—Afghan, না Goorkha, না Buzzard, না Condor?—সবগুলো নাম আমার মুখস্থ। ফ্ল্যাটের মধ্যে চটের আর ধুলোর গন্ধ, রাশি-রাশি বস্তাঝুড়ির কোনো-এক ফাঁকে একটি কেরানি লাল চোখে ঢুলছে—আমরা তক্তার উপর দিয়ে দুলে-দুলে এক ফালি জল পেরোলাম, এই উঠলাম স্টিমারে।

আমরা অবশ্য ডেক্-এর যাত্রী—আমাদের জন্য ক্যাবিন দূরে থাক বেঞ্চিও নেই, আমাদের বসতে হয় পাটাতনের উপর কম্বল অথবা শতরঞ্চি বিছিয়ে—ভাগ্য ভালো থাকলে দোতলায়

কোনো পরিষ্কার কোণে, বা ভিড়ের দিনে একতলাতেই, হয়তো ঝুড়ি-ভর্তি-ভর্তি ভোঁটকা গন্ধের চালানি মুর্গির গা ঘেঁষে। কিন্তু কোথায় বসা হ'লো তাতে আমার কিছু এসে যায় না; আমি স্টিমারে চাপতে পেরেছি ব'লেই খুশি। এখানে মস্ত সুবিধে এই যে ট্রেনের কামরার মতো একই জায়গায় ব'সে থাকতে হয় না সারাক্ষণ। আমি ভালোবাসি একতলা-দোতলায় টহল দিতে, নিষিদ্ধ ফার্স্ট-ক্লাশ-মহলের সীমান্তরেখায় দাঁড়িয়ে খানশামার হাতের চা খাই কখনো — একবার দাঁড়াই শস্তা চায়ের স্টলটির সামনে, যেখানে এক মজার বিজ্ঞাপন লটকানো: 'যাহাতে নাহিকো মাদকতাদোষ / কিন্তু পানে করে চিত্ত পরিতোষ'— ঘন-নীল টিনের পাতের উপর শাদা অক্ষরে লেখা এই সরল পদ্যটি আমাকে কৌতুক-মেশানো আনন্দ দেয়। দেখি নদী রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে—রৌদ্রে মেঘে রকমারি রং ধরে জলে, ওপারের হালকা লাইন কখনো নীল কখনো আবছায়া, হঠাৎ এক-একটা গাংচিল আমার পক্ষে অদৃশ্য মাছ উপড়ে তুলে নিয়ে উড়ে যায়। আর অবশ্য আছে এঞ্জিন-ঘর—আমার ছেলেবেলার মহৎ এক আকর্ষণ।

ঠিক ঘর নয়, একতলায় লোহার রেলিঙে ঘেরা খানিকটা জায়গা—এক আশ্চর্য দৃশ্য চলছে যে-কোনো লোকের চোখের সামনে, কিন্তু দর্শকের ভিড় নেই। অনেক নল পাইথনের মতো মোটা আর প্যাঁচালো, অদ্ভুত চেহারার যন্ত্রপাতি অনেক, ছোটো-বড়ো অনেকগুলো ঘড়ি—ঘড়ি নয়, অন্য কিছু, কোন কাজে লাগে আমি জানি না, শুধু একটাতে দেখি SE, SEE,

NW, NWW ইত্যাদি সব অক্ষর আঁকা, সেগুলির অর্থ আমি আন্দাজে বুঝে নিয়েছি—ওটাই তাহ'লে কম্পাস? দিকচিহ্ন-যন্ত্রের একটি কাঁটা অতি ধীরে নড়ছে অথবা নড়ছে না, কোনো নলের মুখ থেকে ফোঁশফোঁশ বাষ্প বেরোচ্ছে মাঝে-মাঝে, বেজে উঠছে ধারালো শব্দে ঘণ্টা, তিনটে পিস্টন ঘূর্ণিত হচ্ছে অনবরত—আমার মনে হয় কেশর-ফোলানো সিংহের মতো প্রচণ্ড। পিছন ফিরে দাঁড়ালে আমি দেখতে পাই ঘুলঘুলির ফাঁকে অন্য এক ঘূর্ণন, জলটাকে মুচড়ে-মুচড়ে ঘুলিয়ে তুলে প্রকাণ্ড বড়ো চাকা চলছে। আমার মুখে লাগে জলের ছিটে, তপ্ত ধোঁয়া ছিটকে আসে গালের উপর;—আমি আবিষ্ট হ'য়ে যাই জলের গন্ধে, বাষ্পের গন্ধে, গরমে, গর্জনে, কম্পনে, ঢোলা-প্যাণ্ট-পরা টান-চেহারার মাল্লাদের কাজেকর্মেও—সরু সিঁড়ি বেয়ে কেমন দ্রুত ওঠা-নামা করে তারা, এক চিলতে কানার উপর দিয়ে রেলিং না-ধ'রেই হেঁটে-চ'লে বেড়ায়—কাঠবিড়ালির মতো নির্ভয় ও স্বচ্ছন্দ। আর এদেরও মধ্যে অসাধারণ এক যুবক—মাথায় ফেট্টি বাঁধা, গা নগ্ন, হাতে শাবল—এঞ্জিন-ঘরের তলায় নেমে গিয়ে চুল্লির দোর খুলে কয়লা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ঢেলে দেয়, তার বুক-পিঠ ঘামের স্রোতে চকচকে, তার মুখের উপর লকলকে-জিভ আগুনের লাল, তাকে দেখায় প্রায় অলৌকিক ধরনে সুন্দর, কোনো আদিম দানোর মতো গা-ছমছম-করা—এই রহস্যপুরীতে সবচেয়ে সে রহস্যময়।

ফিরতি পথে অন্য এক দৃশ্যের জন্য আমি উৎসুক। সূর্য তখনও ডোবেনি কিন্তু সন্ধ্যার ছায়া নামছে—এমনি সময়ে

পদ্মা পড়ে মেঘনায়; আমাদের সামনে জল নীল অথবা ধূসর, আমাদের পিছনে জল রুপোলি—আসার পথে উজ্জ্বল রোদে এই তফাৎটি ঠিক ধরা পড়ে না—কিন্তু এখন একেবারে স্পষ্ট, কে যেন একটি পরিষ্কার লাইন টেনে ধূসর-শাদাকে ভাগ ক'রে দিয়েছে। ঠিক মোহানার মুখে দুই রঙের মেশামেশিটা দেখতে কী-রকম আমি তা চোখ টাটিয়ে তাকিয়ে থেকেও বুঝতে পারি না; কেবলই মনে হয় শাদা নদীর রং অকস্মাৎ লেখার কালির মতো কালো হ'য়ে গেলো। ক্রমে রাত নামে, অন্ধকারে হারিয়ে যায় নদী, আমি গুটিগুটি পায়ে পোস্টাপিশের সামনে গিয়ে দাঁড়াই—স্টিমারেও একতলার কোণে একটি পোস্টাপিশ থাকে, এটা আমার এক প্রধান আবিষ্কার। একটি আলো-জ্বলা ছোট্ট কামরায় যে-একলা মানুষটি খোপে-খোপে চিঠি ছুঁড়ে দিচ্ছে, আমি তাকে দেখামাত্র ভালোবেসে ফেলি, সে আমার দিকে একবার তাকালেও আমি কৃতার্থ হয়ে যাই—কিন্তু সে তার কাজ থেকে চক্ষু তোলে না। আমি কয়েক পা এগিয়ে চ'লে যাই একেবারে সামনের ডেক্-এ—স্টিমারের এই শেষ প্রান্তটিও আমার দ্রষ্টব্যের তালিকাভুক্ত। এখানে উঁচু ক'রে সাজানো আছে সেই তক্তাগুলো, যা দিয়ে বন্দরে অস্থায়ী সাঁকো তৈরি হয়, আছে বিঁড়ে-পাকানো মস্ত মোটা দড়িদড়া, আরো কত কী সরঞ্জাম, সার্চলাইটটিও এখানেই, আর নদী এত কাছে যে বড়ো ঢেউগুলো পাটাতন ভিজিয়ে দিয়ে যায়। যাত্রীদের এখানে আসা বারণ, কিন্তু মাল্লারা আমার ক্ষুদ্র উপস্থিতিকে গ্রাহ্য করে না,—শুধু তক্তার স্তূপে বসতে

গেলে আপত্তি জানায়। আমি স'রে এসে গলিপথটুকুতে দাঁড়িয়ে থাকি, হু-হু হাওয়ার ঝাপট আমার গায়ে, কানে একটানা ছলছল শব্দ, চোখ জুড়ে অন্ধকার ছড়ানো, আমার একটু-একটু শীত করছে এবং ঘুম পাচ্ছে—কিন্তু হঠাৎ দেখি কুচকুচে জলে তীব্র আলোর চাবুক পড়লো, ধবল ফেনা ধবলতর উচ্ছ্বাসে ছুটে যায়, ক্ষণিক-দৃষ্ট টলোমলো কোনো জেলে-ডিঙির জন্য ভয় করে আমার, আর তক্ষুনি ভেঁপু বেজে ওঠে বিরাট গম্ভীর সর্দি-বসামতো গলায়—অনেকক্ষণ ধ'রে একটানা, আরো অনেকক্ষণ রেশ লেগে থাকে বাতাসে—আমার ইচ্ছে করে দূরে কোথাও চ'লে যাই, অনেক দূর কোনো অচেনা আর আশ্চর্য দেশে—যদিও সে-দেশ কোথায় বা সত্যি আছে কিনা আমি জানি না।

১৮

স্টিমার থেকে নেমে নৌকো, পদ্মায় ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে নৌকো ঢোকে বহরের খালে—তারই পাড়ে বাজার, গঞ্জ, বেচাকেনা—য়োরোপের যে-কোনো দেশে বিখ্যাত নদী হ'তো সেটি।। সেই খালের সরু-সরু আঙুলগুলো চ'লে গেছে গ্রামের মধ্যে ঘর-গেরস্তর উঠোনের ধার দিয়ে-দিয়ে—একেবারে বাড়ির ঘাটে নৌকো বাঁধা হয়। সেগুলিতে পাশাপাশি দুটোর বেশি নৌকো চলে না, জল মন্থর এবং সবুজ, পাঁচ গ্রামের মলে-মূত্রে আবিল—পল্লীবাসীদের 'সবচেয়ে ছোটো ঘর'গুলি বাঁশের খুঁটিতে জলের প্রান্তে ঝুলে থাকে। কখনো গিয়েছি সেই জলপথে গ্রাম থেকে

গ্রামান্তরে; অনেক অলিগলি খাল পেরিয়ে হঠাৎ একটা বিলে এসে পড়লাম—চওড়া বোবা আকৃতিহীন ছড়ানো জল, থিকথিকে কচুরিপানার জন্য ডাঙা ব'লে ভুল হয় কখনো, মাঝে-মাঝে কোমর-জলে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে নৌকো ঠেলে নেয় মাল্লারা—আমি ভাবি, বইয়ে যে-সব হ্রদের কথা পড়ি সেগুলি নিশ্চয়ই এ-রকম নয়? না—এই ভ্রমণগুলিকে কোনোমতেই মনোরম রঙে আঁকা যাবে না—কেননা সঙ্গী নেই 'ছিন্নপত্র' বা অন্য কোনো মায়াবী বই, জলে-স্থলে দুর্বারভাবে গজিয়ে-ওঠা জঙ্গল দেখে-দেখে আমার দম আটকে আসছে। কিন্তু এই সব মালিন্যের দায় তিনগুণ শোধ ক'রে দেয় পদ্মা—বিশাল নদী, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে নৃত্যশীল, প্রখর স্রোতে নিত্যযৌবনা—আমি তখনও জানতাম না এত রূপ নিয়েও ইনি নোয়াখালির মেঘনার মতোই ভাঙতে ভালোবাসেন। পদ্মার উপর দিয়ে ধীরে চলেছি গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে—দূর থেকে দেখছি ব'লে ভিতরকার কোনো কুশ্রীতা চোখে পড়ে না; নাটকের দৃশ্যপটের মতো কোনো জমিদার-বাড়ি, কোনো মন্দির-চূড়ায় ত্রিশূল, কখনো ঝাঁ-ঝাঁ রোদে বালির উপর দিয়ে মাল্লারা গুণ টেনে চলে, কখনো বিকেলের খেলোয়াড় বাতাসে রঙিন একটি পাল তুলে দেয়। পেরিয়ে যাই অনির্বচনীয়-নির্মল চর মাঝে-মাঝে, কোনো-কোনোটা এতই ছোটো যেন জলের উপর চিকনপাটি বিছোনো। হঠাৎ মাঝে-মাঝে কাদা-রঙের গোলাকার কিছু ভেসে ওঠে জল থেকে, তক্ষুনি আবার মিলিয়ে যায়—শুশুক ওরা—আমার দাদামশাই বলেন 'শুশুম'—আমার মনে হয় ওরা

নিজেদের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে, শুধু পিঠটুকু দেখিয়ে, নাক-চোখ-মুখ অদৃশ্য রেখে—এক ফুর্তিবাজ ছেলেমানুষের দল। একবার নৌকো থেকে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছিলাম—বিকেল তখন, পদ্মার বুক রুপোতে-সোনায় বার্নিশ-করা—হঠাৎ একটা বিশাল বেড়াজাল উঠলো জলের তলা থেকে, ঝলক দিলো অগুনতি ইলিশের উজ্জ্বল ধবলতা—একখানা প্রকাণ্ড নীল আকাশের তলায়, পড়ন্ত বেলার অফুরান রৌদ্রে—আমার চোখ দুটো যেন ধাঁধিয়ে গেলো।

গ্রাম সম্বন্ধে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তা বহর থেকেই আহৃত। সেখানকার তালগোল-পাকানো অতি সরব অতি প্রকাশ্য জীবনযাত্রার মধ্যে অনেক-কিছুই আমার ভালো লাগেনি, কিন্তু দুটো-একটা সুখস্মৃতি নেই তাও নয়।

রান্নাঘরের কোণে দেয়ালহীন একটি একচালা—আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, মুগ্ধ। এক মহিলা ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছেন, অন্য একজন গর্ত থেকে চাল তুলে নিয়ে তক্ষুনি আবার ঢেলে দিচ্ছেন ধান—ঢেঁকির মাথাটি উঠে গিয়ে আবার পড়তে যেটুকু সময় নেবে ঠিক সেই ক-টি মুহূর্তের মধ্যে : এমনি বার-বার। আমি শুনছি ছন্দে-বাঁধা দুম্-দুম্ শব্দ, দেখছি এঁদের অঙ্গচালনার মেয়েলি দক্ষতা ; আমার অবাক লাগছে যে প্রথম মহিলার ভুল হচ্ছে না কখনো, দ্বিতীয় মহিলার হাতের উপর একবারও ঢেঁকি পড়ছে না—মুহূর্তের জন্যও না-থেমে কী-দ্রুত

এঁরা কাজ ক'রে যাচ্ছেন—আমার চোখে প্রায় ম্যাজিকের মতো ব্যাপার, কিন্তু এঁদের বাহবা দেবার কেউ নেই। শিউলিতলায় পাগল-পাগল গন্ধ—শরতের কোনো শেষরাত্রে, হয়তো লক্ষ্মীপূর্ণিমা সেদিন — উঠোনে এমন অঢেল জ্যোছনা যে শুধু লাল বোঁটার জন্য শিউলিগুলোকে চেনা যাচ্ছে: আমি মেয়েদের দলের মধ্যে জুটে ফুল কুড়োচ্ছি। রোজ চণ্ডীপাঠ হয় বাড়িতে, যেতে-আসতে আমার চোখে পড়ে তার আয়োজন: ক্ষ'য়ে-যাওয়া শানের উপর কত কী বানানো হচ্ছে, সাজানো হচ্ছে, পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ জ্বলছে আধো-আলোয়। ঠাকুরঘরটি গন্ধে ম-ম করে—ধূপের গন্ধ, ছেঁড়া ফুলের, ঘষা চন্দনের, ঘি, দুধ, নারকোল ইত্যাদির পাঁচমিশোলি গন্ধ একটা—আর ফাঁকে-ফাঁকে প্রাচীনতার সেই ঠাণ্ডা সোঁদা মিষ্টি-মিষ্টি ঝাপসা গন্ধ, যা জীর্ণ দালানটিতে ঢোকামাত্র টের পাওয়া যায়। দুপুরবেলা আসেন রক্তাম্বরধারী পুরুৎঠাকুর, তাঁর গমগমে গলার আওয়াজ দেয়ালে-দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয় ঘণ্টাখানেক ধ'রে—একটি বর্ণ না-বুঝেও দূর থেকে শুনতে আমার মন্দ লাগে না। অন্য এক শব্দে শীতের ভোরে আমার ঘুম ভেঙে গেলো—খিড়কি-পুকুরের দিক থেকে ভেসে আসছে গান, মেয়েদের কাঁচা গলায় ঘুরে-ফিরে: 'ওঠো ওঠো সূ-য্যি ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া/মাঘমণ্ডলের ব-র্ত করুম...' এর পরে আমার ঠিক মনে পড়ছে না—'আমরা যতেক মাইয়া' বা 'তোমার দিমু বিয়া' বা ঐ রকম কিছু হবে। শুনতে-শুনতে আমার শরীরে-মনে সুখ

ছড়িয়ে পড়ে ; আমি যেন শুয়ে-শুয়েই দেখতে পাই আমার আইবুড়ো কিশোরী মাসিরা পুকুর-পাড় ধ'রে সার বেঁধে ঘুরছে গান গাইতে-গাইতে, ফলের বাগিচার ঘন ডালপালার ফাঁকে এইমাত্র ঝিকিমিকি রোদ ফুটলো।

## ১৯

আমার বালকবয়সে ভারতভূমিতে যে-বৃহৎ ঘটনাটি ঘটেছিলো, তার কথা বলার সময় হ'লো এবার।

প্রথম-মহাযুদ্ধ আমার স্পষ্ট মনে আছে। বাড়িতে আসে 'স্টেটসম্যান' দৈনিকপত্র—তাতে দেখি পাতা-জোড়া-জোড়া যুদ্ধের ছবি : হেলমেট-পরা সৈন্যের দল, বড়ো-বড়ো কামান, মানোয়ারি জাহাজ। লোকেদের মুখে-মুখে ফেরে লয়ড জর্জ, মার্শাল ফশ্, লর্ড কিচ্নার, হিণ্ডেনবুর্গ-এর নাম। আমাদের বাড়িতে যাঁদের আসা-যাওয়া চলে তাঁদের মধ্যে দু-একজন আছেন যুদ্ধ-ঘটনার বিশ্লেষক ও ব্যাখ্যাতা : তারা কাগজ পড়েন খুঁটে-খুঁটে, ম্যাপ দ্যাখেন, হিশেব রাখেন কোন পক্ষ কতদূর এগোলো বা পেছোলো, কোন ধরনের কামান কত শক্তিশালী, জলযুদ্ধে জর্মানরা কখনো নেলসনের গুষ্টিকে হারাতে পারবে কিনা তা নিয়ে তাঁরা বিস্তর গবেষণা করেছেন। এঁরা সকলেই হিজ ম্যাজেস্টির অনুগত ভৃত্য—কর্মজীবনে তা-ই—কিন্তু ঘরে ব'সে মুণ্ডপাত করেন ইংরেজদের—খুবই নিচু গলায় অবশ্য—তবু দাদামশাই তাঁর নিবে-যাওয়া বর্মা-

চুরুট টানতে-টানতে ত্রস্ত চোখে ইতি-উতি তাকান, পাছে কোনো টিকটিকি কোথাও আড়ি পেতে শুনে ফ্যালে। ভারতসমুদ্রে 'এমডেন' যখন হুলুস্থুল টর্পেডো চালাচ্ছে তখন তাঁরা হর্ষ লুকোতে পারেননি, 'ব্যাটারা নিপাত যাবে এবার! উচ্ছন্নে যাবে!'—বলতে-বলতে এমনভাবে হেসেছেন যেন তাঁরাই ঘায়েল করলেন ব্রিটিশ সিংহকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খবর এলো 'গড সেইভ দি কিং' মহামন্ত্রটি ব্যর্থ হয়নি, ভগবান ইংলণ্ডেশ্বরকে সত্যিই রক্ষা করেছেন। জয়োৎসবে যোগ দেবার জন্য দাদামশাই আমাকে জিলা স্কুলে নিয়ে গেলেন—সেখানে ছেলেদের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে আউড়ে যেতে হ'লো হেড-মাষ্টার মশায়ের শেখানো কয়েকটা ইংরেজি বুলি, তিনি নিজেও একটি ছোটো বক্তৃতা করলেন—তার সার কথা এই যে ইংরাজ-রাজের জয়লাভে আমরা আনন্দিত। তারপর শীতের রোদ্দুরে ছেলের দল ঘুরে বেড়াতে লাগলো, সকলেরই হাতে স্কুল থেকে বিলোনো কমলালেবু, জামায় আঁটা ছোটো-ছোটো য়ুনিয়ন জ্যাক—স্কুল ছুটি ব'লে সত্যি খুশি।

কিন্তু এই সুদূর যুদ্ধ আমাদের জীবনে কোনো ছায়াপাত করেনি। মাঝে কিছুদিন আমাকে কাঠপেন্সিলের বদলে কাগজের পেন্সিল ব্যবহার করতে হয়েছিলো, আর শাদার বদলে বালি-কাগজ, আর দিদিমা মাঝে-মাঝে উদ্বিগ্ন হতেন পাছে এবার বালামের বদলে রেঙ্গুনি চাল খেতে হয়—এটুকু ছাড়া আর কোনো ফলাফল আমার মনে পড়ে না। কিন্তু আর্মিস্টিসের অল্প দিন পরেই অন্য এক যুদ্ধ শুরু হ'লো—একেবারে

নতুন ধরনের—আর তা আমাদেরই দেশে, আমাদেরই চোখের সামনে, আমাদেরই জীবনের মধ্যে তোলপাড় তুলে।

নন্‌-কো-অপারেশন। অসহযোগ। সত্যাগ্রহ। এই নোয়াখালি শহর—দৈবাৎ যেখানে ছিটকে পড়েছি আমি, আর সে-সময়ে আমার যেটাকে মনে হচ্ছিলো দরিদ্র এবং মলিন এবং দম-আটকানো—সেখানেও তরঙ্গ এসে পেঁছিলো। মেঘনার শরের চেয়েও উত্তাল, বারো-শো ছিয়াত্তরের বন্যার চেয়েও কূল-ভাসানো।

প্রায় অজ্ঞান বয়স থেকেই আমি চা-খোর, ততদিনে এমন বয়সে পেঁচেছি যখন সকালবেলায় আধো-ঘুমের মধ্যে লোহার কেটলির ঘণ্টাধ্বনি শুনেও আনন্দ পাই, পিঙ্গলবর্ণ চায়ের রসে ধবল দুধ যখন ঘন মেঘের মধ্যে হালকা মেঘের মতো মিশে যায়, আমার মনে হয় একটি সচল রঙিন ছবি দেখছি। আর তার স্বাদ—গোলাপফুল-আঁকা ধোঁয়া-ওঠা পেয়ালায় প্রথম চুমুক—তুলনা হয় না! সেই চা, যার নতুন নাম হয়েছে 'কুলির রক্ত', আমি এক দমকে ছেড়ে দিয়েছি। ঘামছি সারা দুপুর চটের মতো মোটা খদ্দরে: নিয়মিত পড়ছি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া', 'বাংলার বাণী'; লিখছি নবযুগের বন্দনা, দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস, একটা গল্পের আকারে লিখে ফেলেছি পল্লীজীবনের প্রশস্তি—যে-জীবন আমি আসলে কখনো ভালোবাসতে পারিনি—নজরুল ইসলাম নামে এক সৈনিক-কবির বীররসাত্মক কবিতা প'ড়ে আমি মুগ্ধ। একটি চরকাও আছে আমার, চালাই মাঝে-মাঝে—কিন্তু আমার হাতে যে-সুতো উৎপন্ন হয়

তা দড়ির মতো মোটা আর সন্নেসির জটার মতো গুলতি-পাকানো। কোনো অনুষ্ঠান বাদ দিইনি আমি—অনেকগুলো স্বরাজ-টিকিট কিনে ফেলেছি; ঘরে ঝুলছে ভারত-মাতা ক্যালেণ্ডার, যাতে ভারতের ভাগ্যতরণীর হাল ধ'রে ব'সে আছেন মহাত্মা গান্ধী, আর দাঁড় টানছেন চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, লজপৎ রায়, পণ্ডিত মালব্য আর দুই ভাই মহম্মদ আলি শৌকত আলি—আর উপর থেকে স্মিতহাস্যে তাকিয়ে দেখছেন পদ্মধারিণী লক্ষ্মীরূপিণী ভারত-মাতা। একবার, এমনকি, স্বরাজের তারিখ এগিয়ে আনার জন্য, বাড়ির মহিলাদের কিছু শাড়ি-জামা নিয়ে বহ্ন্যুৎসবও করলাম। আমার দুঃখ শুধু এই যে এত ক'রেও গ্রেপ্তার হবার এবং জেলে যাবার যোগ্য হ'তে পারছি না। আমার চেয়ে মাত্র চার-পাঁচ বছরের বড়ো কয়েকটি ছেলে—তারাও দিনসাতেক কাটিয়ে এলো সেই গরীয়ান স্থানে, বেরোনোমাত্র অভিনন্দন পেলো ফুলের মালা, গান গাইতে-গাইতে টহল দিলো সারা শহর — আর আমি, শুধু কয়েকটা বছর দেরিতে জন্মেছিলাম ব'লে, নেহাৎই একজন দর্শক হ'য়ে বাইরে প'ড়ে রইলাম। আমি যে বেঁটে, আমি যে তোৎলা, আমার লেখাগুলো যে সম্পাদকেরা অনবরত ফেরৎ পাঠাচ্ছেন — এই সব দোষের যেন রাতারাতি খণ্ডন হ'য়ে যেতো, শুধু একবার ইংরেজের কয়েদখানার ভিতরটা যদি দেখে আসতে পারতাম!

এক বছর কেটে গেলো, দু-বছর কেটে গেলো, স্বরাজ এলো না। জেল-ফেরতা ছেলেরা গুটি-গুটি পায়ে স্কুলে ঢুকেছে

আবার, কোনো-কোনো উকিল-মোক্তার নতুন ক'রে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন, ঘরে-ঘরে চলছে আগের মতোই টাট্টু-মার্কা ল্যাঙ্কাশিয়র-বস্ত্র। কিন্তু আমার পরনে এখনো খদ্দর, চা আমার অস্পৃশ্য।

নোয়াখালিতে আমাদের সর্বশেষ দিনগুলি আমার স্মৃতিতে বড়ো অস্পষ্ট, প্রায় অন্ধকার। এমনকি, আমার আশৈশব চেনা শহর ছেড়ে চ'লে আসার দিনটিও আমার মনে পড়ে না। এর পরে পর্দা উঠলো ঢাকায়, দাদামশাই লম্বা ছুটি নিয়ে চ'লে এলেন। আমার বয়স তখন তেরো পার।

২০

ঢাকায় আমি আগেও কয়েকবার এসেছিলাম, তার মধ্যে এক-বারের কথা খুব মনে পড়ে।

উপলক্ষ ছিলো এক জোড়া-বিয়ে। প্রথমটি সত্যেন্দ্র-ছানার, সেই যাঁদের চট্টগ্রামে চারিচক্ষে মিলন হয়েছিলো, অন্যটি দিদিমার এক ভাই-ঝির। দেওর-ঝি-ভাইয়ের ব্যাপারটিতে ঘটকালি করেছিলেন স্বর্ণলতা, মৃত দাদার মেয়ের বিয়েতেও তিনিই প্রধান কর্মকর্ত্রী — আমরা অনেকটা আগেই চ'লে এসেছি। যে-বাড়িটা ভাড়া নেয়া হয়েছে সেটার নাম মোতি-মহল, অবস্থান মুসলমানবহুল উর্দু পাড়ায়, গড়নপেটনও মুসলমানি। প্রকাণ্ড চক-মিলানো বাড়ি — মধ্যিখানে শান-বাঁধানো মস্ত আঙিনা, দোতলায় তিন দিক জুড়ে উঠোন-মুখো বারান্দা চ'লে গেছে, রাস্তার দিকে চওড়া আর-একটা বারান্দা।

ঘর অনেকগুলো, প্রতিটি নায়র-নায়রীতে গুলজার! কোথাও জোর তাস-পেটানো চলছে, কোথাও শালী-ভগ্নীপতি শালাজ-ননদাইদের হাসি-মশকরা, কোথাও তর্ক বেধে গেছে কুলীন ভঙ্গ-কুলীন ও বঙ্গজের তারতম্য নিয়ে, কোথাও কয়েকটি মহিলা গোল হ'য়ে ব'সে, পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে, অসাধারণ একঘেয়ে সুরে যৌথকণ্ঠে বিয়ের গান গাইছেন। অন্য ধরনের গানও আছে অনেক : কোনো খুকি মেয়ে, যেন আট বছর বয়সেই পরলোকের ডাক শুনতে পেয়ে, হার্মোনিয়মের চাবি টিপে-টিপে কাঁদুনি গাইছে যেহেতু 'শরীর-পিঞ্জরে জীবন-বিহঙ্গ চিরকাল ব'সে থাকবে না'; গ্রামোফোনে যখন-তখন বেজে উঠছে একেবারে উল্টোভাবের 'তুমি কাদের কুলের বৌ', 'আধো-আঁচরে বোসো', ইত্যাদি। দিদিমার পিতৃকুল সংগীতপ্রিয়, মেজো ভাই নগেন্দ্রনাথ ভালো হার্মোনিয়ম বাজান — তাঁর পাল্লায় প'ড়ে আমিও দু-একটা গৎ বাজাতে শিখে ফেলেছি। শোনা যাচ্ছে শিশুর কান্না মাঝে-মাঝে, গঞ্জিকাসেবী পাচক-ভৃত্যদের ভাঙা গলার চ্যাঁচামেচি, কোথায় যেন ঝনঝন শব্দে এক পাঁজা কাঁসার বাসন প'ড়ে গেলো। যাকে বলে হিন্দু বিয়ে-বাড়ি — ফেলাছড়া, হৈ-চৈ, গণ্ডগোল, আত্মীয়ের আত্মীয় ও কুটুম্বের কুটুম্ব নিয়ে এক বিরাট পারিবারিক সম্মেলন যার মেয়াদ এক মাসেও ফুরোতে চায় না — তারই একটি সর্বলক্ষণযুক্ত নমুনা আমি মোতি-মহলে দেখেছিলাম সেবার।

বিয়ের পরদিন সত্যেন্দ্র-ছানা বেরোলেন কোনো জমিদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত একটি ল্যাণ্ডোগাড়িতে, গাঁটছড়া-বাঁধা অবস্থায়;

আমি, বোধহয় নিতবর হিশেবে, সঙ্গী হয়েছিলাম। কেন যাওয়া, কোত্থেকে কোথায়, সে-সব আমার কিছুই মনে নেই, কিন্তু ভ্রমণের মুহূর্তগুলো ভুলিনি। আমি ব'সে আছি উল্টো দিকের সরু আসনটায়, বর-বধূর মুখোমুখি; গদির চামড়ার গন্ধ, নতুন বৌয়ের গা-থেকে-বেরোনো সুঘ্রাণ, পট্টবস্ত্রের খশখশানি, প্রকাণ্ড দুটো ঘোড়ার সমতালে-পড়া খুরের শব্দ, রঙিন কাচের জানলা-দিয়ে-দেখা লালচে অথবা সবজে রঙের শহর — সব মিলিয়ে আমার মনটাতে যেন ঝিমুনি এনে দিয়েছিলো, আমি যেন আশ্চর্য এক জগতের আভাস পেয়েছিলাম — খুব ঝাপসাভাবে, কয়েকটা মুহূর্তের জন্য। কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানের অন্য একটা ছবি — ক্ষণিক নয়, ঝাপসা নয় — এখনো আমার চোখে লেগে আছে।

সেদিন ছিলো ছানার পাকস্পর্শ. সন্ধে পেরিয়ে গেছে। দোতলায় রাস্তার দিকের চওড়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ছিপছিপে হালকা চেহারার মেয়েটি — একটা আলপনা-আঁকা হলুদ-রঙা পিঁড়ির উপর পা রেখে; আর সামনের সিঁড়ি দিয়ে একে-একে উঠে আসছেন সত্যেন্দ্রর বন্ধুরা — ঢাকা কলেজে তাঁর সহপাঠীর দল — নববধূর হাতে দিয়ে যাচ্ছেন টুকটুকে লাল রিবনে বাঁধা বইয়ের প্যাকেট — পাঁচ-টাকা-দামের টয়লেট-বাক্স বেরোয়নি তখনও, তাই শুধু বই। এক-একবার দু-হাতে-ধরা বইয়ের ভারে নুয়ে পড়ছে মেয়েটি, অন্য কেউ তার হাত থেকে নিয়ে তুলে রাখছেন। কিন্তু, খুব স্বাভাবিক কারণেই, নববধূর তখন বইয়ে মন নেই, অন্যেরাও দৃকপাত

করছেন না সেদিকে — পরদিন থেকে পুরো সম্ভারটি আমারই অধিকারভুক্ত হ'য়ে গেলো। তখনকার দিনের গরম-কাটতির সব বই — একখানাও রবীন্দ্রনাথ নয় : তুলোর প্যাডে বাঁধাই 'বাণী' 'কল্যাণী', সিল্কে বাঁধাই 'হিমালয়', 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' ; শরৎচন্দ্র, অনুরূপা, নিরুপমা ; গুরুদাস কোম্পানির আট-আনা-সিরিজ একরাশি ; প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্প, যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা'— এ-সব পেরিয়ে 'গৃহলক্ষ্মী', 'কুললক্ষ্মী', 'পাক-প্রণালী' পর্যন্ত কিছুই আমি বাকি রাখলাম না। সে-যাত্রায় আমার হার্মোনিয়ম-শিক্ষা 'কে রে হৃদয়ে জাগে'-র পরে আর এগোয়নি—এবং সেখানেই জীবনের মতো সমাপ্ত হয়েছিলো — কিন্তু বাংলা ভাষার কথাসাহিত্যে সেই আমার উপনয়ন বলা যায় ; এক টানে অতগুলো বাংলা উপন্যাস আমি পরেও আর কখনো পড়িনি।

## ২১

আমি ধারাবাহিকভাবে ঢাকায় ছিলাম মাত্র সাড়ে-নয় বছর, কিন্তু ছিলাম ঠিক সেই বয়সটায় যেটা মানুষের জীবনে সবচেয়ে সগর্ভ ও প্রভাবশালী। ভাবলে মনে হয় — আমার মধ্য-তিরিশ থেকেই তা-ই মনে হচ্ছে — যেন কতকাল ছিলাম আমি সেখানে, ঢাকার বছরগুলি ভ'রে যেন অনেক-কিছু ঘটেছিলো, আমি অনেক-কিছু করেছিলাম — মনে হয় যেন দিন রাত্রি ঋতু বৎসর অমন বিচিত্রভাবে ও প্রগাঢ়ভাবে আমার চেতনায় আর প্রবিষ্ট হয়নি। এই অনুভূতি সবচেয়ে তীব্র

হ'য়ে ওঠে ঢাকায় আমার প্রথম পাঁচ বছরের কথা ভাবলে — যখন পর্যন্ত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিনি, 'প্রগতি' পত্রিকা প্রস্ফুট হয়নি ছাপার অক্ষরে। আমার এই মনে-হওয়ার সঙ্গে তথ্যের কোনো সংগতি নেই তা না-বললেও চলে : আসল কথা, আমি তখন উত্তীর্ণ হচ্ছি বাল্য থেকে কৈশোরে আর কৈশোর থেকে নবযৌবনে ; আসল কথা, আমি তখন আমি হ'য়ে উঠছি, আবিষ্কার করছি নিজেকে। আস্তে-আস্তে, বা দ্রুতবেগে, আমার শরীর-মনের এনভেলাপে পোরা অস্তিত্বটাকে বদলে দিচ্ছিলেন প্রকৃতি দেবী; তাঁর নেপথ্যকর্মের সহযোগী ছিলেন আমার সৌভাগ্য-লব্ধ বন্ধুরা। তাঁদের মধ্যে সকলের আগে আমার মনে পড়ে বুদ্ধু-দাকে — পোশাকি নাম প্রভুচরণ, পদবি গুহ-ঠাকুরতা।

আমরা ঢাকায় আসার পরে একমাসও কাটেনি। আছি ওয়াড়িতে তেইশ নম্বর র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটে — পাঁচিল-ঘেরা কম্পাউণ্ডওলা পরিচ্ছন্ন একটি একতলায়। একদিন বেলা দশটা নাগাদ বাইরে কড়া ন'ড়ে উঠলো ; আমি দরজা খুলে দেখি, একটি অচেনা যুবক সাইকেলের হাতল ধ'রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরনে ধবধবে খদ্দরের ধুতি, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া আর চাদর, শেল্-ফ্রেমের চশমার পিছনে চোখ দুটি ব্রাউন এবং উজ্জ্বল, গালের হাড় উঁচু, গায়ের রং লাল-মেশানো ফর্শা, ঠোঁটের হাসি মনোমুগ্ধকর। আমার মনে হ'লো এমন একটি সুন্দর মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি, মনে হ'লো এক দেবদূত আমার সামনে দাঁড়িয়ে। দু-একটা কথার পরে বোঝা গেলো তিনি আমারই কাছে এসেছেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই নিবিড় হ'য়ে উঠলো যোগাযোগ। প্রায়ই যাই লক্ষ্মীবাজারে তাঁদের বাড়িতে — আমার জীবনে আড্ডার স্বাদ সেখানেই প্রথম। জনবহুল বাড়ি, আবহাওয়া খোলামেলা ও দরাজ; কে বাসিন্দা আর কে আগন্তুক তা ঠিকমতো ঠাহর করা শক্ত। অনেক ভাই-বোন বুদ্ধু-দার, সকলেই বয়সে তাঁর ছোটো: ভাইয়ের চাইতে বোনের সংখ্যা বেশি, বোনেদের মধ্যে কয়েকটি আমার কাছাকাছি বয়সের তরুণী। তারা সকলেই সুন্দরী এবং তাজা, ইডেন-স্কুলের কৃতবিদ্য ছাত্রী, সুভাষিণী ও সপ্রতিভ। পুরো পরিবারটি খুব সহজে আমাকে কাছে টেনে নিলেন; আমি স্বচ্ছন্দে অন্তঃপুরে বিচরণ করি, বোনেরাও আমাকে স্নেহের চোখে দেখছেন, বড়ো বোন গায়ত্রীর সঙ্গে আমি বিশেষভাবে মনের মিল খুঁজে পাই। আমাকে বলা হয়েছে আমি তাঁদের আত্মীয়, কিন্তু আমার মন বলছে আত্মীয়তাটা কিছু নয়, বন্ধুতাই আসল। আর এই বন্ধুতার ভিত্তি হলেন প্রভুচরণ — বোনেদের উজ্জ্বল উপস্থিতি সত্ত্বেও এ-বাড়িতে তিনিই আমার কেন্দ্র।

গুহ-ঠাকুরতা-বাড়ির আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য— তা হ'লো গান। বুদ্ধু-দা নিজে, তাঁর বোনেরা, আর দৈবক্রমে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও—এমন কেউ নেই যাঁর গলায় সুর না আছে, এবং যিনি মনের আনন্দেই যে-কোনো সময় গেয়েও না থাকেন—বিনা সাধ্য-সাধনায়, বিনা হার্মোনিয়মে। আর সেই গান কোনো ধর্মসংগীত বা ব্রহ্মসংগীত নয়—'ফাল্গুনী'র, 'প্রবাহিণী'র গান, বর্ষার ও শরতের, বা রবীন্দ্রনাথের এমন কোনো

রচনা যা এই সেদিনমাত্র 'প্রবাসী'তে বা 'সবুজপত্রে' ছাপার অক্ষরে পড়েছিলাম। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে পরিবারটির সংযোগ ছিলো : 'কাব্যপরিক্রমা'র লেখক অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রভুচরণের এক-পিসিমার বিবাহ হয়, বন্ধুদের মধ্যেও অনেকে ছিলেন বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র। দল বেঁধে রাস্তায় চলতে-চলতে এঁরা গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠেন, বাড়ির মধ্যে মেয়ে-পুরুষের গলায় ডুয়েট চলে মাঝে-মাঝে, কখনো ওঠে হাসি-ঠাট্টার হিল্লোল—গানে গল্পে কৌতুকে আনন্দে বাড়িটি একেবারে ভরপুর।

প্রভুচরণ কিন্তু বাড়ির ঘেঁষাঘেঁষির মধ্যে থাকেন না, রাস্তা পেরিয়ে আলাদা একটি ঘর আছে তাঁর — সেখানে কিছু বই আর শাদাশিধে টেবিল চেয়ার তক্তাপোশ নিয়ে তিনি রাত্রে ঘুমোন আর দিনের বেলাতেও থাকেন বেশির ভাগ। বাড়িতে তাঁর জন্য লবণহীন আলাদা ব্যঞ্জন রান্না হয় — সবই নিরামিষ কিনা সেটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না। অশনে-বসনে তাঁকে বলা যায় গান্ধীবাদী, কিন্তু তাঁর মন যে-সব রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তার একটিও সবরমতীর অভিমুখী নয়। তাঁর কাছে মাঝে-মাঝে দেখি 'ভ্যানগার্ড' নামে একটা পত্রিকা—খুব সম্ভব সরকারি হিশেবে নিষিদ্ধ, ট্রটস্কিবাদের কোনো মুখপত্র হয়তো —রুশীয় বিপ্লবের ঢেউ ততদিনে ভারতের তট ছুঁয়েছে—এবং ঢাকাও সেই সময়ে ছিলো বঙ্গীয় সন্ত্রাসবাদের রাজধানী। কিন্তু প্রভুচরণকে বিপ্লব-ঘেঁষা মানুষ ব'লেও মনে হয় না—

তাঁর চরিত্রের প্রধান লক্ষণ প্রকাশ্যতা ও প্রফুল্লতা, তাঁর চিত্তবৃত্তি রসগ্রাহী ও নান্দনিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি নিয়ে এম. এ. পড়ছেন তিনি, কিন্তু কলেজি গণ্ডির সীমা ছাড়িয়ে তাঁর আগ্রহ নানান দিকে বিস্তীর্ণ। দেশ-বিদেশের সাহিত্য নিয়ে তিনি কথা বলেন আমার সঙ্গে; আমাকে পড়তে দেন হুইটম্যান, আর এমন অনেক লেখকের উপন্যাস ও গল্পের বই যাঁদের নামগুলো অদ্ভুত এবং অনিংরেজ। তাঁর বন্ধু-সম্প্রদায়টি বিচিত্র — কেউ বর্ণিলবেশী চিত্রকর, কেউ রসিকতায় দক্ষ, কেউ বা ফুটবল-খেলোয়াড়, কেউ ডিগ্রিধারী উচ্চাভিলাষী পরিপাটি যুবা, আর কেউ বা জীবনটাকে হেসে-খেলে উড়িয়ে দিতে চান—নানা ভিন্ন ধরনের মানুষকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছেন প্রভুচরণ। তাঁরই মধ্যস্থতায় আমার নবযৌবনের প্রথম সমবয়সী সাহিত্যিক বন্ধুকে আমি পেয়েছিলাম — তাঁর পিসতুতো ভাই টুনু, অজিত দত্ত — অতি সুদর্শন একটি ছেলে, যার দিকে, বুড়িগঙ্গার ধারে বেড়াবার সময় আমার চোখ আর মন আগেই আকৃষ্ট হয়েছিলো।

বুদ্ধু-দা হঠাৎ একদিন ঢাকা ছেড়ে চ'লে গেলেন -- কাছা-কাছি কোথাও নয়, একেবারে সাত সমুদ্রের ওপারে, সুদূর ও অস্পষ্ট দেশ আমেরিকায়। অন্য অনেকের মতো আমিও তাঁর সঙ্গে এলাম নারায়ণগঞ্জের স্টিমার-ঘাট পর্যন্ত, স্টিমার ছেড়ে যাবার পরেও তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ: বস্টনে পৌঁছে তিনি দেশ থেকে প্রথম যে-চিঠিখানা পেয়েছিলেন, সেটি আমার লেখা। ফিরে এলেন তিন বছর পরে হার্ভার্ড আর লণ্ডনের

ডিগ্রি নিয়ে, বিলাসী এক যুবক — সিল্কের পাঞ্জাবি ছাড়া পরেন না, রোজ একটিন ক'রে গোল্ড ফ্লেক ওড়ান, তাঁর পায়ে দেখা যায় এক-একদিন এক-এক ফ্যাশানের স্যাণ্ডেল — এদিকে তাঁর আড্ডার ঝোঁক, সাহিত্যচর্চার ঝোঁক যেন আগের চেয়েও প্রবল। তিনি বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছেন অনেকগুলো চলতি-কালের ইংরেজ-মার্কিন উপন্যাস, তাঁর সান্ধ্য আসরে প'ড়ে শোনান সেগুলো থেকে — দানাদার গলায়, সুন্দর উচ্চারণে। বাড়ির হালচালও কিছু বদলে গেছে তাঁর জন্য — আগেকার মতো পিঁড়িতে ব'সে কাঁসার থালায় আর খাওয়া হয় না, শাদা-চাদর-পাতা টেবিলের উপর ঝকঝক করে কাচের আর চীনে-মাটির বাসন; সম্প্রতি তাঁরা সদর ঘাটের কাছে যে-বাড়িতে উঠে এসেছেন সেটিও বেশ রমণীয়। এই সবই খুব মনোমতো হ'লো আমার, কেননা ততদিনে আমি হারিয়ে ফেলেছি নোয়াখালির সেই খদ্দর-পরা কুঁকড়ে-থাকা ছেলেটাকে— আমার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে, মাথায় বেশি না-বাড়লেও মুখে-চোখে জেল্লা ধরেছে কিছুটা: চা খাচ্ছি অঢেল, চুল রেখেছি কপাল-ছাপানো ঝাঁকড়া, খদ্দরের সঙ্গে এখন আর আমার সম্পর্ক নেই। আমি জানি না কবে এবং কেমন ক'রে এই পরিবর্তনগুলো ঘটেছিলো, তবে এটুকু জানি এর পিছনে আমার কোনো সংকল্প ছিলো না — কোনো দ্বিধা আমাকে বিব্রত করেনি, কারো দৃষ্টান্ত আমাকে উদ্বুদ্ধ করেনি — আমার শরীর-মনের সাধারণ পরিবর্তনের মতো এও যেন 'এমনি-এমনি' হ'য়ে

গিয়েছিলো। আর — যদিও গলার আওয়াজ লজ্জাকরভাবে তিন টুকরো হ'য়ে যাচ্ছে — তবু আমার সেই উৎপীড়ক তোৎলামিও যেন নিজে-নিজেই ছেড়ে গিয়েছে আমাকে — পুরোপুরি নিস্তার দিয়েছে তা নয়, কিন্তু অন্তত সেটাকে চাপা দিয়ে রাখার কায়দাগুলো আমি অনেকটা রপ্ত ক'রে নিয়েছি। প্রভুচরণকে বিদায় দেবার সময় আমি নতুন ভর্তি হয়েছি কলেজিয়েট স্কুলে নয়ের ক্লাশে, আর এখন আমি ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র, সিগারেট আমার অস্বাদিত নেই, আর্মানিটোলার পিকচার-হাউসে আমি নিয়মিত দর্শক। আছি বিধবা দিদিমার সঙ্গে শহর থেকে দূরে, একটি টিনের বাড়িতে। কষ্টে আছি বলা যায় না।

## ২২

প্রাক-ম্যাট্রিক শেষ ক্লাশ দুটো আমি স্কুলে পড়েছিলাম — ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। আগে কখনো ক্লাশ-ঘরে আটক থাকিনি, কিন্তু সেখানকার শৃঙ্খলা মেনে নিতে আমার অসুবিধে হ'লো না, কেননা আমি বাড়ির মধ্যেও এক ধরনের নিয়মে-বাঁধা দিন কাটিয়েছি — সেটাই আমার ভালো লাগতো ব'লে। তাছাড়া, আমার দাদামশাই আমাকে অনেক আগে থেকেই স্কুলের জন্য তৈরি ক'রে তুলেছিলেন; আমার সাহিত্যিক ঝোঁকটাকে ষোলো আনা প্রশ্রয় দিয়েও অন্য কোনো জরুরি বিষয়ে আমাকে পেছিয়ে থাকতে দেননি।

গণিতে আমি স্বাভাবিকভাবে নির্বোধ — যে-বয়সে

ওঅর্ডস্বার্থের পল্লীবালিকারা আমাকে উন্মন ক'রে দিচ্ছে, সেই বয়সে অঙ্কে আমার হাতে-খড়ি। মনে পড়ে একক-দশক-শতক-সহস্র রপ্ত করতে আমি নাকের জলে চোখের জলে ভেসেছিলাম, দু-একটা চড়-চাপড়ও সইতে হয়েছিলো। কিন্তু সেই প্রথম কাঁটাবনটুকু পেরোবার পর আস্তে-আস্তে যেন সহজ হ'য়ে এলো সব; দাদামশাই আমাকে যখন একশো-পেরোনো মৌখিক যোগ অভ্যাস করান আমি বড়ো একটা ঠেকি না; ল. সা. গু. গ. সা. গু.-তে পৌঁছে এমনকি খানিকটা মজাও লাগলো—আমি সেগুলোকে বলি 'সিঁড়ির অঙ্ক'—পুনরাবৃত্ত দশমিকটাও এক কৌতুক। নোয়াখালি-বাসের শেষের দিকে, যখন আমার কলম থেকে ফিনকি দিয়ে গদ্য-পদ্যের ধারা ছুটছে, সেই একই সময়ে আমি তোড়ে ক'ষে যাচ্ছি পর-পর অনেকগুলো পাটি-গণিত আর বীজগণিত বইয়ের প্রশ্নমালা, বীজগণিতটা উপাদেয় লাগছে রীতিমতো। সংখ্যা, অক্ষর ও নানান ধরনের চিহ্নযুক্ত এক-একটা বিরাট ও বিদঘুটে চেহারার ব্যূহ যখন আমার পেন্সিলের খোঁচায় কুঁকড়ে যেতে-যেতে অবশেষে একটি একাক্ষরে এসে ঠেকে, আমার মনে হয় আমি যুদ্ধে নেমে দুষমনগুলোকে কচু-কাটা ক'রে দিলাম। এতে অবশ্য আমার অঙ্কের মাথা খুলে যায়নি—সেটা কখনো হবার ছিলো না—ম্যাট্রিকের পরেই জীবনের মতো বিদায় দিয়েছিলাম গণিতকে, আর আজ আমার এমন অবস্থা যে দশমিক মুদ্রার সুবিধে সত্ত্বেও, অতি সাধারণ একটা বাজার-হিশেবেও হিমশিম খাই। তবু মনে হয়, এই চর্চায় আমি অন্য ভাবে উপকৃত হয়েছিলাম—

তা আমাকে সাহায্য করেছিলো মানসিক আলস্য কাটিয়ে উঠতে, অপ্রিয় কাজে পরিশ্রমী হ'তে শিখিয়েছিলো। যে-সব মানুষের কল্পনার দিকে টান বেশি, তাদের জীবনে এই শিক্ষাটি মূল্যবান।

ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলটি অনেক কালের নামজাদা—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমল থেকেই মর্যাদাবান। দাঁড়িয়ে আছে ঢাকার প্রধান নাগরিক অঞ্চলে সগৌরবে, গোল মোটা রোমক-থামওলা উন্নতশির অট্টালিকা — পূর্বযুগে এটাই ছিলো ঢাকা কলেজ। সামনে ভিক্টোরিয়া পার্ক, আশে-পাশে অনেকগুলো বড়ো রাস্তার মোড়, এক মিনিট দূরে সুন্দর গড়নের হলুদ-রঙা একটি গির্জে, যার মস্ত গোল ঘড়িটার দিকে আমি সতৃষ্ণ চোখে তাকাই মাঝে মাঝে — যখন শুক্রবারে ক্লাশের ঘণ্টা চারটে পেরিয়ে যায়, বিকেলের রোদে জ্বলজ্বল করে গির্জের চুড়ো, আর ঘড়ির কাঁটা যেন নড়ে না। নিচু পাঁচিলে ঘেরা মস্ত ছড়ানো চৌহদ্দির মধ্যে স্কুল, সুরকির পাড়-বসানো হরতন-আকৃতির ছোটো একটি বাগানও আছে — সেখানে ফোটে রং-বেরঙের বিলেতি ফুল। সিঁড়ি, মেঝে, বারান্দা সব তকতকে পরিষ্কার; ক্লাশ-ঘরগুলোতে আলো-হাওয়া প্রচুর খেলে, কিন্তু কম্পাউণ্ড পেরিয়ে গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ লেশমাত্র পৌঁছয় না। এ-পর্যন্ত সবই ভালো; — কিন্তু এই ধরনের শান্ত পরিবেশে যতটা শিক্ষা দত্ত ও প্রাপ্ত হ'তে পারে, দুঃখের বিষয়, তার অর্ধভাগও হ'য়ে ওঠে না।

ভূগোলের ক্লাশ আমার খুব মনে পড়ে। স্কুলে আছে ভূগোলের জন্য আস্ত একটি আলাদা ঘর — অনেকগুলো বড়ো-ছোটো গ্লোব, মডেল, আর নানা রকম কৌতূহলজনক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো ; কিন্তু আমাদের অজানা কোনো-এক কারণে সেই ঘরে কখনো নিয়ে যাওয়া হয় না আমাদের, কোনো যন্ত্রের ব্যবহার হয় না কখনো। কেন ঋতুগুলো ঘুরে-ঘুরে আসে আর যায়, কেন ছোটো-বড়ো হয় দিন-রাত্রি, কেন মেরু-অঞ্চলে শীতে সূর্য অদৃশ্য থাকে আর গ্রীষ্মে অন্ধকার প্রায় নামেই না— এ-সব রহস্য, যা কল্পনাকে চনবনে ক'রে তোলে, আর জ়ুল ভের্ন আর জগদানন্দ রায়ের সুস্বাদু পাতায় অনেক আগেই যার বিবরণ আমি পড়েছিলাম—স্কুলে তা বুঝে নিতে হয় নেহাৎই কতগুলো নির্জীব অক্ষর থেকে, বুঝে নেবার ব্যর্থ চেষ্টায় হাঁপিয়ে উঠতে হয় — কেননা ছাপার অক্ষরে যা লেখা আছে তার উপর মাষ্টারমশাই নিজে বিশেষ-কিছু যোগ করেন না। তিনি আদেশ দেন : 'পরের দিন সমস্ত সাউথ আমেরিকা প'ড়ে আসবে !', আদেশ দিয়ে বাড়ি চ'লে যান, কিন্তু আমরা ভেবে পাই না ঐ বিপুল মহাদেশটাকে কেমন ক'রে এক গণ্ডূষে গ্রাস করা যায়। তিনি পড়া নেন : আর্জেন্টিনায় কী-কী দ্রব্য উৎপন্ন হয়, পাম্পাস অঞ্চলের কত বর্গ-মাইল আয়তন, পেরুর জলবায়ু কোন ধরনের — আমরা উত্তর দিয়ে যাই যার যেটুকু সাধ্য ; কিন্তু যে-মহাদেশের ম্যাপটি অমন বিচিত্র আর শহরগুলোর নাম যেন পাখির গলার কলরব করে, তার কোনো মূর্তি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে না — মনেই হয় না সেটা

একটা সত্যিকার দেশ যেখানে সত্যিকার মানুষ থাকে। তেমনি, অঙ্কের ক্লাশেও মাষ্টারমশাই চেয়ারে ব'সেই পড়িয়ে যান, আঙুল নেড়ে-নেড়ে শূন্যে আঁকেন জ্যামিতির চিত্র — ফিটফাট মানুষ, চকখড়ির গুঁড়োয় হাত ময়লা করার ইচ্ছে নেই — অদৃশ্যের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সারি-সারি তরুণ চোখে ঝিমুনি নামে, মসৃণ কপাল কুঁচকে যেতে থাকে ক্রমশ। কিন্তু এ-সবের চেয়েও যে-গলতিটা বড়ো — বিশেষ কোনো স্কুলের বা শিক্ষকের নয়, মৌলিক — সেটা ঘটেছিলো এই কারণে যে চতুর ইংরেজ পুরো দেশটাকে বেকুব বনিয়ে রেখেছিলো। আমাদের ইংলণ্ডের ইতিহাস বইটা রঙিন-ছবি-ওলা ঝকঝকে — হাতে নিলেই প'ড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে আর পড়তেও মন্দ লাগে না; আর 'হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া'র চেহারাটা যেমন হতশ্রী লেখাও তেমনি জবড়জং, তার সঙ্গে আবার জুড়ে দেয়া হয়েছে একটা 'ইংল্যাণ্ড'স ওঅর্ক ইন ইণ্ডিয়া' — ভারতেশ্বর ইংরেজ জাতির গুণকীর্তন। ভূগোলের বইয়ের তিনবার-দাগানো দুটি প্রশ্ন হ'লো: 'বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না', আর 'বৃটিশ মুকুটের উজ্জ্বলতম মণি ভারতবর্ষ'; — এই সূত্র দুটোকে, বছরের পর বছর, যারা ভারতবর্ষেরই নিরীহ বালকবালিকাদের গলা দিয়ে নামিয়ে দিয়েছিলো, তাদের গভীরবুদ্ধির তারিফ না-ক'রে উপায় নেই।

কিন্তু এ-সবও তুচ্ছ হ'য়ে যায় যখন রাজভাষার সঙ্গে মাতৃভাষার বিস্তীর্ণ ব্যাবধানের কথা মনে পড়ে। সপ্তাহের মধ্যে ইংরেজি ক্লাশ সবচেয়ে বেশি, সেগুলির জন্য প্রথম ঘণ্টাটি বরাদ্দ—

আর বাংলা আসে বিকেলের দিকে গড়িমসি ক'রে, আর দিনের শেষ ক্লান্ত ক্লাশটিতে সংস্কৃত। ইংরেজিতে আমাদের পাঠসূচিতে আছে সংক্ষেপিত 'আইভ্যানহো', এক ক্যান্টো 'মার্মিয়ন', কনান ডয়লের 'দি লস্ট ওঅর্ল্ড' নামে একটা বিজ্ঞানোপন্যাস — কোনোটাই শুকনো কাঠ নয়, শেষেরটা এমনকি ক্লাশ-ঘরেও সুখদায়ক ;– এদিকে বাংলায় আমাদের চিবোতে হয় 'প্রভাত-চিন্তা'র পাথর-কুচি, জিভে না-ছুঁইয়ে গিলে ফেলতে হয় চলৎ-শক্তিহীন চলিত ভাষায় লেখা টুটকো এবং অখাদ্য এক 'উন্নত জীবন' — এ-সবের সঙ্গে 'কথা ও কাহিনী'টাও আছে ব'লে বাংলা ক্লাশে আমাদের প্রাণপক্ষী শুকিয়ে মরে না। সপ্তাহে একটি ক'রে ইংরেজি রচনা আমাদের দিয়ে লিখিয়ে নেন হেডমাষ্টারমশাই — বিরলদর্শন রাশভারি মানুষ, পড়াবার ধরনটি চমৎকার — কিন্তু বাংলায় সে-রকম রেওয়াজ নেই, বা কাগজে-পত্রে নিয়ম থাকলেও কাজে হ'য়ে ওঠে না। স্কুলের লাইব্রেরিটি নেহাৎ ফ্যালনা নয়, সেখানে থ্যাকারের উপন্যাস পর্যন্ত পড়তে পাওয়া যায় – মাষ্টারমশাইরা তা অনুমোদনও করেন — কিন্তু তুলনীয় কোনো বাংলা বই আছে কি নেই সেই খবরটুকুও আমরা জানতে পারি না। মোদ্দা কথাটা এই যে ইংরেজি ভাষাটাই আসল এবং মুখ্য এবং প্রধান — মাষ্টারমশাইরা তা জানেন আর ছাত্ররাও তা মেনে নিয়েছে — এটাকে কোনো অস্বাভাবিক অবস্থা ব'লে কারো মনে হচ্ছে না। তবু এও সত্য যে আমার স্কুলে-কাটানো সবগুলো ঘণ্টা ব্যর্থ হয়নি, আর তা শুধু এজন্যেই নয় যে সেখানে আমার

আবাল্য-চেনা ইংরেজিতে আমার কিছু বানান-ভুল শুধরেছিলো। সংস্কৃত ব্যাকরণে যেটুকু কাণ্ডজ্ঞান আমার আজ পর্যন্ত সম্বল তা সেখানকার হেডপণ্ডিতের কাছেই কুড়িয়ে-পাওয়া, তাঁরই সাহায্যে সমাস জিনিশটার বিপুল ক্ষমতা আবিষ্কার ক'রে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম, এও বুঝেছিলাম কেমন অল্প হেরফেরই বাংলা বিশেষ্য থেকে নিটোল এক-একটি বিশেষণ বেরিয়ে আসে। মন করলে স্কুলের দু-বছরে আমি আরো একটু তৈরি হ'তে পারতাম সংস্কৃতে, কিন্তু সেই অজ্ঞান বয়সে সেটাকে তেমন জরুরি ব'লে মনে হয়নি।

কলেজিয়েট স্কুলের ঠিক পিছনেই ধবলবর্ণ জগন্নাথ কলেজ। তার কম্পাউণ্ডের মধ্য দিয়ে আমি কয়েক মিনিটের হাঁটা-পথ সংক্ষেপ করি — তখন থাকি অনেক দূরে লালবাগে, আমার টেস্ট পরীক্ষার দেরি নেই, শীত পড়ি-পড়ি। যেতে-আসতে মাঝে-মাঝে দেখি একদল ছেলেকে—যুবক তারা, কলেজে পড়ে, চলাফেরার ধরন বেপরোয়া ফুর্তিবাজ — ওদের মধ্যে এক-মাথা-কোঁকড়া চুলের শ্যামলবর্ণ একটি ছেলেকে বিশেষভাবে চোখে পড়ে আমার। মনে-মনে আমি তাদের ভালোবাসি, তাদের দেখলে আমার দুঃখ হয় আমি এখনো নেহাৎ স্কুল-পড়ুয়া আছি ব'লে। পরে অবশ্য, মাত্র বছর দেড়েকের মধ্যে, আমি এই পুরো দলটিকে যেন অনিবার্যভাবেই ধ'রে ফেললাম, তারা কেউ-কেউ আমার নিবিড় বন্ধু হ'য়ে উঠলো — কিন্তু ততদিনে সেই কোঁকড়া চুলের ছেলেটি আর ঢাকায় ছিলো না। থাকলে

আরো সুখের হ'তো – কেননা তারই নাম প্রেমেন — প্রেমেন্দ্র মিত্র — যার গল্পে-কবিতায় 'কল্লোল' তখন বোলবোলাও।

২৩

স্কুলে পড়ার সময় আমার জীবনে যে-নতুন একটি সুখ যুক্ত হয়েছিলো আগে তার উল্লেখ করেছিলাম, এখানে কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখলে অবান্তর হবে না।

চলচ্চিত্র আমি প্রথম দেখেছিলাম নোয়াখালির টাউন-হল্-এ, নেহাৎই আক্ষরিক অর্থে চলৎ-চিত্র। দুটো জোয়ান লোক ঘুষোঘুষি করছে, তীরে এসে লাগছে সমুদ্রের ঢেউ, তিনটি খড়ের-টুপি-পরা মেমসাহেব সাইকেল চেপে হুশ ক'রে ছুটে চ'লে গেলো। টুকরো ছবি, শুধু নড়ছে, বড্ড বেশি নড়ছে : ভুতুড়ে, ঝাপসা, অবাস্তব। এই টাউন-হল্ মঞ্চেই অন্য যা-সব দেখেছি — নাট্যাভিনয়, ম্যাজিকের খেলা, একই মুখ থেকে দুই গলায় বেরোনো কণ্ঠ-কসরৎ, অথবা একবার কাচারি-ময়দানে যে-সার্কাস দেখে আমি ট্র্যাপিজ-নাচুনি মেয়েটাকে আর ভুলতে পারিনি, সে-সবের তুলনায় এই নতুন তামাশা 'বায়োস্কোপ'টাকে আমার মনে হয়েছিলো বিতিকিচ্ছিরি – কোনো মাথামুণ্ডু নেই। দ্বিতীয় নমুনাও নোয়াখালিতে, সেটাতে ছিলো ইংরেজ-জর্মান লড়াইয়ের দৃশ্য — ছবিগুলো অনেক পরিষ্কার, কিন্তু এত বেশি ট্যাঙ্ক বন্দুক কামানের ধোঁয়া আর জর্মান-দলের নৃশংসতাগুলো এত

স্পষ্টভাবে বানানো, যে আমি হাড়গোড়সুদ্ধু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, চলচ্চিত্র বিষয়ে আর কৌতূহল অনুভব করিনি। কিন্তু ঢাকায় আসার পর — কিছুদিনের মতো — আমি হ'য়ে উঠেছিলাম বিলকুল একজন সিনেমাখোর, আমার একটি প্রধান প্রিয় স্থান আর্মানিটোলার পিকচার-হাউস, শহরের একমাত্র ছবিঘর সেটি।

অর্ধচন্দ্রাকৃতি সাইনবোর্ড, সন্ধের পরে একটি বাল্‌বে আলো জ্বলে। ভিতরটা খুব খোলামেলা — জমি, বাগান, গাড়ি চলার রাস্তা, একপাশে টবের গাছ অনেকগুলো — সেখানে বেতের চেয়ারে ব'সে মাঝে-মাঝে আড্ডা দেন মালিক ও তাঁর বন্ধুরা। চিত্রশালাটি চটকদার নয় — লম্বা ছাঁদের গুদোমের মতো গড়ন, দেয়ালগুলো শাদামাটা চুনকাম-করা, টিনের ছাদের তলায় কোনো সীলিং নেই — বসার জন্য চেয়ার মাত্র একসারি, আর আছে তক্তাপোশের উপর গদি-আঁটা চেয়ারে দুটি 'বক্স' — অত্যধিক মূল্যবান ব'লে খালি প'ড়ে থাকে সেগুলো, অথবা পাশ নিয়ে ভাগ্যবানেরা আসেন। পালা-বদল হয় বুধবারে আর শনিবারে: সে-দু'দিন সকালে একটি ঘোড়ার গাড়ি বেরোয় যার ছাদের উপরে চলে ব্যাগপাইপ আর ঢাকের বাদ্যি, আর ভিতরে ব'সে দুটি লোক মুঠো-মুঠো ছড়িয়ে যায় বাংলায় আর ইংরেজিতে ছাপা হলদে লাল সবুজ কাগজে হ্যাণ্ডবিল। ঢাকের শব্দে ছুটে যাই আমি রাস্তায়, বিজ্ঞাপনের রগরগে বিশেষণগুলোয় আমার মন নেচে ওঠে — আমি পারতপক্ষে একটা পালাও বাদ দিই না, প্রয়োজনীয় সিকিটি জোটাতে

এক-এক সময় বেশ বেগ পেতে হয়। আর সেই সিকির বিনিময়ে যেখানে ঢুকি, সেটা এক আজব দেশ।

প্রায়ই চলে ধারাবাহিক ছবির পালা, ডনকুস্তি লম্ফঝম্পে জমজমাট। বীর এডি পলো, বলবান এল্মো লিঙ্কন, আর অবশ্য অরণ্যবাসী মহান টার্জান — এঁদের হাজার-বিজয়ী রোমাঞ্চ-সিরিজ আমি অনেক দেখেছি লম্বা টুলে ঘেঁষাঘেঁষি ব'সে, কখনো বা দেয়ালে ঠেশান দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে — আমার কানে অর্গ্যান আর বেহালার বাজনা, আমার নাকে বিড়ির ধোঁয়ার ঘন গন্ধ — যার উৎস আমার চার-আনা-মহলের প্রতিবেশীরা, ঢাকার চলতি ভাষায় যাদের বলা হয় 'কুট্টি' — গাড়োয়ান, ফেরিওলা, বাখরখানিওলা, রাজমিস্ত্রি, এমনি সব। তারা ইংরেজি অক্ষর চেনে না, জানে না কোথায় আফ্রিকা বা আমেরিকা, কিন্তু সবচেয়ে সহৃদয় আর সরব দর্শক তারাই — ঠিক বুঝে নেয় কোথায় কী হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে; সারাক্ষণ মন্তব্য ছুঁড়ে দেয় ফিল্মের লোকগুলোর দিকে, সময় বুঝে 'আবে! মার্দিস!' ব'লে চেঁচিয়ে ওঠে, যৌথভাবে হাততালি দেয়, নায়কের শত্রুপক্ষীয় ষণ্ডাগুলোর মুণ্ডপাত করে — আর শেষ ক্লোজ-আপ চুম্বনের সময় তাদের শিসের শব্দে তীক্ষ্ণ উল্লাস আলো জ্বলার পরেও থামতে চায় না। পিকচার-হাউসের ভিতরটার কথা ভাবলেই আমার মনে পড়ে এই 'কুট্টি'-সম্প্রদায়কে — লুঙ্গি আর রঙিন গেঞ্জি পরনে, মুখে রসিকতার ফুলঝুরি, শপথ-বুলিতে চ্যাম্পিয়ন, ভাঙা উর্দু আর খাশ-ঢাকাই বাংলা মেশানো যাদের মুখের ভাষা গাড়োয়ানের

হাতে চাবুকের শব্দের মতোই কনকনে — আর বাইরে থেকে যাদের দেখে মনে হয় জাত-বোহেমিয়ান, কালকের জন্য কোনো মাথা-ব্যথা নেই, ফুর্তির ফেনা ছিটোতে-ছিটোতে ভেসে চলেছে সারাক্ষণ।

কিন্তু এমন নয় যে পালোয়ানি ফিল্ম ছাড়া আর-কিছু দেখানো হয় না পিকচার-হাউসে। কখনো আসেন মেক-আপ-জাদুকর লন চ্যানি তাঁর কারুণ্য নিয়ে, আবির্ভূত হন বিশ্বমোহিনী ম্যারি পিকফোর্ড, ক্যাথিড্রেলের ঘড়ির কাঁটা ধ'রে হ্যারল্ড লয়ডকে শূন্যে ঝুলে থাকতে দেখা যায়। আর মাঝে-মাঝে, 'তৎসহ দুই খণ্ড কমিক' ব'লে বিজ্ঞাপিত ছোটো ছবিতে আমি দেখতে পাই অসাধারণ এক মুখ — এক মানুষ, এক চরিত্র — ছোট্ট গোঁফ, বেঢপ জুতো, ঢোলা পাৎলুন আর হাতে একটা ছড়ি নিয়ে যিনি চোখে ঠোঁটে গালে কাঁধে চলার ভঙ্গিতে কথা বলেন, ছড়িয়ে দেন বেদনা-মেশানো কৌতুক, নিজেকে নিজে ঠাট্টা ক'রে যেন হাসির অছিলায় হৃদয় ছুঁয়ে যান। আর তারপর একদিন ছোট্ট ছেলে জ্যাকি কুগানের সঙ্গে একটা লম্বা ফিল্মে দেখলাম তাঁকে ; তিনি আমাকে জয় ক'রে নিলেন।

চ্যাপলিনের প্রথম যুগের সেই চিত্র-কথিকাগুলি আমি আরো একবার দেখেছিলাম — বহুকাল পরে, ন্যুয়র্কের এক বিশাল ও বিলাসী রঙ্গালয়ে — সঙ্গে ছিলো চ্যাপলিনের স্বকণ্ঠে বলা ধারা-মন্তব্য। হলিউডের জন্মকথা বলছিলেন তিনি —

সেই যখন দিগন্ত-জোড়া শূন্য জমি প'ড়ে আছে ক্যালিফর্নিয়ায়: কেউ এলো, একটা যে-কোনোরকম ছাউনি তুলে ক্যামেরা খাটিয়ে শুরু ক'রে দিলো ছবি তুলতে — সরঞ্জাম বেশি কিছু নেই, পূর্বরচিত কোনো গল্পাংশ নেই, নটনটীদের বিশেষ-বিশেষ আঙ্গিক দক্ষতা জোড়া দিয়ে-দিয়েই 'প্লট' তৈরি হচ্ছে। আমার ঝাপসা-স্মৃতির দৃশ্যগুলি একের পর এক দেখতে-দেখতে, সিনেমার ছেলেবেলার গল্প শুনতে শুনতে, আমিও কিছুক্ষণের জন্য আমার ছেলেবেলায় ফিরে গিয়েছিলাম।

## ২৪

আমার দাদামশায়ের রোগদুঃখভোগ ও মৃত্যুর বর্ণনা আমি দু-বার লিখেছি — 'অন্য কোনখানে' উপন্যাসে, সম্প্রতি 'পাতাল থেকে আলাপ'-এ। ঢাকায় আসার স্বল্পকাল পরেই তাঁর কণ্ঠ-নালীতে ক্যানসার ধরা পড়লো — প্রথমে তিনি চেষ্টা করলেন আয়ুর্বেদ, তারপর স্যুট-প্যাণ্ট-পরা ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'লো রেডিয়ম-চিকিৎসার জন্য রাঁচিতে — ঢাকায় ফিরে আসার পরে ডাক্তাররা তাঁকে অনিবার্যের হাতে সঁপে দিলেন, গলার মধ্যে লুকিয়ে-থাকা নিত্য-বেড়ে-ওঠা সেই শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁরা অসহায়। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দিদিমা আনান হরিদ্বার থেকে মহামূল্য মৃগনাভি, পুরুৎ ডেকে স্বস্ত্যয়ন করান বাড়িতে, রোগীকে খাওয়ান ঘড়ির কাঁটায় তাঁদের সনাতন স্বর্ণসিন্দূর, বেদানার রস — তাঁর চেষ্টা বিরামহীন, তাঁর সেবা

দিনে-রাত্রে অক্লান্ত : সবই নিষ্ফল। এক আউন্স তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করতে দাদামশাইয়ের প্রাণ বেরিয়ে যায়, আর যেটুকু বা গিলতে পারেন তাও তাঁর শরীরটাকে মুচড়ে-দুমড়ে বেরিয়ে আসে কিছুক্ষণ পরে, রক্ত কফ পিত্তের সঙ্গে মিলে-মিশে। শেষের ক-মাস তাঁর বাক্‌শক্তি রহিত হয়েছিলো, কাগজে লিখে-লিখে কথাবার্তা চালাতেন — সবচেয়ে বেশি লিখতেন আমার উদ্দেশে, পুরোনো অভ্যেস-মতো ইংরেজি ভাষায় — প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর চেতনায় কোনো বিকার ঘটেনি। অকথ্য সেই যন্ত্রণা, যা দু-বছর ধ'রে তিনি ভোগ করেছিলেন — দিনের পর দিন — যতদিন-না তাঁর চর্মাবৃত কঙ্কাল থেকে অবশেষে প্রাণবায়ু নিঃসৃত হয়েছিলো।

মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণীর সেই ভয়াবহ সংগ্রাম আমি চোখে দেখেছিলাম, সব অনুপুঙ্খসমেত আজকাল আমার মনে পড়ে মাঝে-মাঝে — এবং এও মনে পড়ে যে সেই সময়ে আমি ঘটনাটিকে ভালো ক'রে লক্ষ করিনি, অনুভব করিনি। রোগ, অবক্ষয়, মৃত্যু — যা-কিছু নিরানন্দ, অসুন্দর, জীবন-বিরোধী, সে-দিক থেকে আমি যেন নিজের অজান্তেই চোখ ফিরিয়ে রেখেছিলাম, বা চোখে দেখেও মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারিনি। আমার দাদামশাই, সেই 'দা' — মাত্র কয়েক বছর আগেও আমি যাঁকে চোখে হারিয়েছি, কোনো রবিবার সকালে বাজার থেকে যাঁর ফিরতে দেরি হ'লে আমার কান্না পেয়ে গেছে, যাঁর গায়ের জামায় বর্মি চুরুটের গন্ধটাও খুব ভালো লাগতো আমার — সেই তাঁর মৃত্যুতে আমি যেটুকু কষ্ট

পেয়েছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি কেঁদেছিলাম লিটল নেল্‌-এর মৃত্যুর বিবরণ প'ড়ে — কেননা কল্পনায় কান্নাও সুখের। প্রকৃতি, আমাদের আদিমাতা, যাঁকে সাধারণত স্নেহময়ী ব'লে ভেবে থাকি আমরা, অথচ যাঁর নিষ্ঠুরতারও অন্ত নেই, তাঁরই খেলার পুতুল আমি তখনও ; — আমি উন্মীলমান, আমাকে হাজার হাতে টেনে নিচ্ছে জীবন — ভালো, নিষ্ঠুর, অতীতহন্তা, ভবিতব্যময়, নীতিজ্ঞানহীন জীবন — সেই গতিবেগ ব্যাহত করার মতো শক্তি আমার নেই।

দাদামশাইয়ের মৃত্যু হয়েছিলো আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার মাস ছয়েক আগে ; অবিলম্বে আমাদের আশ্রয় দিলেন দিদিমার মেজো ভাই নগেন্দ্রনাথ, যিনি আমাকে মোতি-মহলে হার্মো-নিয়ম বাজাতে শিখিয়েছিলেন। তিনিও পুলিশ বিভাগে কর্ম করেন, থাকেন নগরপ্রান্তিক লালবাগে একটি সুন্দর বাড়িতে, পুলিশ-লাইনের ময়দানের মুখোমুখি : তাঁকে, তাঁর স্ত্রী উষা-বালাকে আমি ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি — দু-জনেই আমার প্রতি খুব স্নেহশীল। দোতলার দক্ষিণ-খোলা সেরা ঘরটি তাঁরা ছেড়ে দিলেন আমাকে, আমি সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশনের পাট চুকোলাম। লম্বা গ্রীষ্মের ছুটিতে দু-একমাস কাটলো আর্মানিটোলায়, দিদিমার ডাক্তার-ভাইয়ের বাড়িতে, যুদ্ধ-ফেরতা ব'লে যাঁকে সবাই বলে ক্যাপ্টেন ঘোষ — তাঁর ছিলো আমার প্রতি ঈষৎ কঠিন সমালোচকের দৃষ্টি, সেই সঙ্গে ভালোবাসাও ছিলো। এর পরে, আমি যখন আই. এ. ক্লাশে ভর্তি হয়েছি বা হবো-হবো, তখন আমরা চ'লে

এলাম পুরানা পল্টনে — যাকে তখন পর্যন্ত অনেকেই বলে সেগুনবাগান। আমার সেই সত্ত-পেরোনো কৈশোর-সীমায়, অপর্যাপ্ত আলো হাওয়া আকাশের মধ্যে, ঐ স্থানটিকে আমি কত বিচিত্রভাবে দেখেছিলাম ও অনুভব করেছিলাম, আমার 'আমরা তিনজন' গল্পটায় তার নিদর্শন আছে।

ঢাকা শহরের উত্তর প্রান্তে, রেল-লাইন পেরিয়ে দূরে, বিশ্ববিদ্যালয়-পাড়া রমনার পূর্ব সীমান্তে একটি মস্ত বড়ো সেগুনের বন প্রথম ঢাকায় এসে আমিও দেখেছিলাম। কবে উচ্ছিন্ন হ'লে সেই বন, সরকারি চাকুরেদের জন্য নতুন একটি পল্লীর পত্তন হ'লো সেখানে, সে-সব আমি কিছুই জানি না — কিন্তু এ-কথা ঝাপসাভাবে শুনেছিলাম আমার দাদামশাই সেখানে একটি প্লটের জন্য বায়না দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তার পরেই অসুখে পড়লেন তিনি, কিস্তি চালানো আর সম্ভব হ'লো না; তাঁর টেলিগ্রাফ-মাষ্টার মেজো ভাই সেটি কিনে নিলেন। ততদিনে তাঁদের বহরের বাড়ি পদ্মার জলে তলিয়ে গেছে — তার ধ্বংসাবশিষ্ট কিছু করগেট-করা টিন ছিলো দিদিমার প্রাপ্য, তা-ই দিয়ে স্বামীর স্মৃতিরঞ্জিত জমির উপর একটি বাড়ি তুললেন তিনি — সেই আমাদের সাতচল্লিশ নম্বর পুরানা পল্টন, ক্ষণজীবী 'প্রগতি' মাসিকপত্রের কার্যালয়। ঢাকার মধ্যে অনেকবার ঠাঁই নাড়ার পরে সেখানে কাটলো একটানা আমার জীবন — যতদিন না, কলেজি পড়াশুনো সাঙ্গ, কপর্দকহীন, জীবিকায় নির্ভর লেখনী, আমি চ'লে এলাম সেই মহানগরে, যেটাকে ততদিনে আমি

আমার পক্ষে একমাত্র সম্ভবপর বাসস্থান ব'লে চিনে নিয়েছিলাম।

২৫

আমার ঢাকা-বাসের প্রথম তিন-চার বছরের মধ্যে আমার জীবন বহুদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হ'লো — তার কারণ সেই নানান ধরনের নতুন মানুষেরা, যাদের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ চেনাশোনা হচ্ছে, এবং সেই আরো বিচিত্র কল্পনার মানুষেরাও, যাদের কথা রুদ্ধশ্বাসে পড়ছি বইয়ের পাতায়। এক-একটা বছর, এক-একটা বাড়ি—তা আমার মনে জড়িত হ'য়ে আছে কোনো-না-কোনো বইয়ের সঙ্গে, লেখকের সঙ্গে: সেগুলোই আমার নিশানা, আমার পথের চিহ্ন। চোদ্দ নম্বর যুগীনগর: ডিকেন্স, বর্নার্ড শ, আমার চোদ্দ বছরের জন্মদিনে উপহার-পাওয়া একটি লাল মলাটের অক্সফোর্ড-সংস্করণ শেলি; 'লিপিকা', 'ঘরে বাইরে', 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক 'রমলা'। ওয়াড়িতে অন্য একটি বাড়ি, দাদামশাই মৃত্যুশয্যায়: আমাকে সাঁড়াশির মতো আঁকড়ে ধরেছে 'কাউন্ট অব মন্টি ক্রিস্টো' উপন্যাসটা। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা কাবার: দল বেঁধে সদর-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমাদের গলা থেকে অনর্গল বেরোচ্ছে 'ক্ষণিকা', 'অভ্র-আবীর', 'বিদায়-আরতি'—আর সদ্য-বেরোনো 'আবোলতাবোল' যার কবিতাগুলো 'সন্দেশ' থেকেই আমার কণ্ঠস্থ। পুরানা পল্টন: রাতের

অন্ধকারে মশারির তলায় শুয়ে-শুয়ে আমি পাগলের মতো আউড়ে যাচ্ছি 'পূরবী' থেকে কবিতার পর কবিতা। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ : তুর্কি ধরনের জাফরি চুড়ো খিলান-ওলা লাল-রঙের দোতলা বাড়ি--দুটো ক্লাশের ফাঁকে ঝুলন্ত একটি ব্যাল্কনিতে ব'সে আমি নিবিষ্ট হ'য়ে আছি চেখভের ছোটো-গল্পে—মাঝে-মাঝে সংস্কৃত ক্লাশে পিছনের বেঞ্চিতেও সেটাই প'ড়ে যাই—শুধু দৃশ্যত 'রঘুবংশ' খোলা থাকে, একদিন পণ্ডিতমশাই তা নিয়ে মন্তব্য ক'রে আমাকে লজ্জা দিয়েছিলেন। লালবাগ, শীত ঋতু চলছে, আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি। আমার নড়বড়ে গণিত-বিদ্যাকে মজবুত ক'রে তোলার জন্য সকালে আসেন একচক্ষু, শ্মশ্রুধারী, কঠোরদর্শন, শিক্ষাপটু এক প্রৌঢ়; দুপুর ভ'রে কুস্তি চালাই জ্যামিতির জটিলতর হেঁয়ালিগুলোর সঙ্গে, যা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকতে চায় না; খুলে বসি লংম্যান্স-গ্রীনের ভূগোলবৃত্তান্ত, যার রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যের গুণে পৃথিবীর নদীগুলোকেও মরুভূমির মতো নীরস ব'লে মনে হয় আমার ;—কিন্তু বিকেলবেলা টুনু নিয়ে আসে তার জগন্নাথ কলেজ লাইব্রেরি থেকে টুর্গেনিভ্‌, কখনো হয়তো ক্নুট হামসুন, য়োহান বোইয়ার—আমার বুকের মধ্যে আনন্দে দুলে ওঠে। আনন্দ আমার—যখন পড়ন্ত রোদে সুরকির রাস্তায় লাল ধুলো উড়িয়ে পোস্টাপিশের টকটকে লাল এক্কা-গাড়িটা আমাদের দরজায় এসে থামে, আর খাকি-পোশাক-পরা কাঁধে-ব্যাগ-ঝোলানো ডাকপিওন আমার হাতে দিয়ে যায় আশ্চর্য সব তৈজস—নিয়মিতভাবে, প্রতি সোমবার।

প্রভুচরণের প্রবাসকালে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিলো নিরবচ্ছিন্ন। অবিরাম আমি লিখে যাচ্ছি, অবিরাম তাঁর চিঠি পাচ্ছি। যাওয়া-আসায় মাস তিনেক সময় কেটে গেলে ঠিক উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে না, চলে শুধু যার-যার উপস্থিত মুহূর্তের বিবরণ, আক্ষরিক অর্থে পত্রালাপ। সুখের বিষয়, পত্ররচনায় উভয় পক্ষেরই আগ্রহ ও ক্ষমতা অসামান্য. দু-জনেই— যাকে বলে একটু উচ্ছ্বাসী ধরনের মানুষ, এবং এমন বিষয়েরও অভাব নেই যাতে দু-জনেই সমানভাবে উৎসাহী। বস্টন থেকে, লস এঞ্জেলিস থেকে, সান্টা ফে থেকে—পুলম্যান-ট্রেনের কামরা থেকে কখনো—তারপর লণ্ডন রোম প্যারিস বার্লিন স্টকহল্‌ম থেকে আসছে তাঁর চিঠির পর চিঠি—আর সেই সঙ্গে নানা দেশের বই, আর মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা—রাশি-রাশি—বিচিত্র। তাঁর চিঠি হাতে পাওয়ার মুহূর্ত থেকে আমার সম্ভোগ শুরু হ'য়ে যায়: সারি সারি বিদেশী ডাকটিকিট, ইস্ত্রি-করা কাপড়ের মতো কড়কড়ে কাগজ; কত অচেনা ভাষায় রাস্তার নাম, হোটেলের নাম—আর ভিতরে কত গল্প, কত নতুন খবর, কত স্নেহ-সম্ভাষণ! বই আসে ইবসেন, ম্যাটারলিঙ্ক, গোর্কী, আণ্ড্রীয়েভ, অস্কার ওয়াইল্ড, শ্যন ও'কেইসি, সমকালীন মার্কিন কবিতার সংকলন, আসে ন্যুয়র্কে মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনয়-ঋতুর চিত্রময় অনুষ্ঠানলিপি, চিঠির মধ্যে সংবাদপত্রের কর্তিকা—পাভলোভার নৃত্য, ডুজের অভিনয়, শোপ্যাঁর সংগীত বিষয়ে আলোচনা। এর মধ্যে যা-কিছু আমি ঠিকমতো বুঝি না সেগুলিরও কিছু দেবার থাকে আমাকে—বইগুলোর গায়ে

উন্মাদক এক গন্ধ, মুদ্রণের প্রসাধন, ছবি, আর অনেক দূর দেশের বাতাসের ছোঁওয়া। পুরো পাশ্চাত্য জগৎ, ক্যালিফর্নিয়া থেকে রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, সেখানকার শিল্প সাহিত্য জীবন-যাত্রা, প্রাণবন্ত ভূগোল, আমার চোখে-না-দেখা কিন্তু মনের মধ্যে বাস্তব-হ'য়ে-ওঠা কত নদী নগর নর-নারী—এ-ই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন প্রভুচরণ, আমার চোদ্দ থেকে ষোলো বছরের মধ্যে, আমি যখন একটি চারাগাছের মতো মাটির তলা থেকে উদ্গত হচ্ছি, চাচ্ছি আমার সরু-সরু ডালগুলোকে জগৎ-জোড়া আকাশের দিকে তুলে ধরতে।

বিদেশে যাবার আগে বুদ্ধু-দা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর ব্যবহৃত একখানা পলগ্রেভ—তাঁর হাতে মার্জিনে লেখা নোটগুলোর জন্য আমার কাছে দ্বিগুণ মূল্যবান। সেই বইটি থেকে শেলি, কীটস, বায়রন, ব্রাউনিঙের অনেক কবিতা আমি ব্লটিং-কাগজের মতো শুষে নিয়েছিলাম; এঁদের যে-ক'টি লাইন এখনো আমার ক্ষীয়মাণ স্মরণশক্তিতে আটকে আছে, তার অধিকাংশই তখনকার সঞ্চয়। এমনও বলা যায় আমার বয়ঃসন্ধির জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে এঁরাই আমাকে উদ্ধার করেছিলেন—পলগ্রেভের এই রোমান্টিক কবিরা—আর অবশ্য আমাদের রবীন্দ্রনাথ।

২৬

ঢাকার স্থানীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন পরিমলকুমার ঘোষ। ইংরেজির অধ্যাপক তিনি, কবিখ্যাতিও আছে কিছুটা। মানুষটি স্নিগ্ধ স্বভাবের, গাল দুটি সুগোল ও চিক্কণ, চুল পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো, খুব পান-জর্দা খান। মৃদু তাঁর কথা বলার ধরন, চলাফেরার তাল মন্থর। তাঁকে আমি প্রথম দেখেছিলাম বালক বয়সে—আমাকে নিয়ে এসেছিলেন দাদামশাই—আমরা ঢাকায় বসবাসের জন্য চ'লে আসার পর সেই পরিচয় সহজেই পুনরুজ্জীবিত হ'লো। তিনি যখন আমাকে প্রকাশ্যে সাহিত্যিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তখনও আমি স্কুল থেকে বেরোইনি। ঢাকা থেকে বেরোলো পূর্ববাংলার পক্ষে অভূতপূর্ব পত্রিকা 'প্রাচী'—'প্রবাসী' ছাঁদের পরিপুষ্ট ও সচিত্র মাসিক; পরিমল ঘোষ তাতে প্রকাশ করলেন আমার কবিতা, আর দুই-কিস্তি-জোড়া একটা গল্প। কবিতাটায় একটা লাইন ছিলো—'মনের মধ্যে শাসন ওঠে জেগে'—সম্পাদক-মণ্ডলীর একজন ঐ 'মধ্যে' কথাটায় আপত্তি তুলেছিলেন, তাঁর মতে 'মাঝে' আরো শ্রুতিমধুর হবে—কিন্তু পরিমল ঘোষ বললেন, 'ঐ যুক্তাক্ষর হ'লো ঝর্নার জলে পাথরের মতো—ওটা থাক।' খুব সম্ভব তাঁরই প্ররোচনায় বা পরামর্শে, বাংলাবাজারের এক পাঠ্যপুস্তক-বিক্রেতা আমাকে এমনকি গ্রন্থকারের মর্যাদা দিলেন—গাঁটের কড়ি খসিয়ে, একটি কপিও

বিক্রির আশা না-রেখে। চটি কবিতার বই—আমি নাম দিয়েছিলাম 'মর্মবাণী', তখন-পর্যন্ত-জীবিত দাদামশায়ের নামে একটি বাগ্‌বহুল উৎসর্গলিপি লিখেছিলাম। বালি-কাগজে ছাপা, চেহারা যতদূর সম্ভব আটপৌরে, আমার পক্ষে খেদজনকভাবে 'হাতছানি' কথাটা ছাপা হয়েছে 'হাতসানি'—তবু যা-ই হোক একটা বই তো। মুন্সিগঞ্জে যেবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'লো—আমার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরে লম্বা ছুটি চলছে তখন—আমি অনেকগুলো কপি সঙ্গে নিয়ে গেলাম।

আমার সাহিত্যসম্মেলনে যাওয়াটাও পরিমল ঘোষেরই জন্য ঘটেছিলো। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন সঙ্গে ক'রে, তাঁর পক্ষপুটের তলায় আশ্রয় দিয়ে, তাঁর সঙ্গে একই বাড়িতে রাখলেন আমাকে, আর তারপরে দাঁড় করিয়ে দিলেন স্বরচিত কবিতাপাঠের জন্য—সেই মঞ্চে, যেখানে ব'সে আছেন শরৎচন্দ্র আর নাটোরের জগদিন্দ্রনাথ, আর কলকাতা ও পূর্ববাংলার অনেক সাহিত্যিক ও বিদ্বজ্জন—হল্‌-ভর্তি বহু ভদ্রমহোদয় আর সামনের সারিতে কতিপয় ভদ্রমহিলারও দৃষ্টির সামনে। আমি চোখে ঝাপসা দেখলাম, আমার পা কাঁপতে লাগলো—কবিতাটা পড়তে শুরু ক'রে মধ্যপথে হঠাৎ আক্রান্ত হলাম আমাব পুরাতন বাকবিলোপকারী রসনাবৈকল্যে—আমার হাত থেকে পাণ্ডুলিপি টেনে নিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে কবিতাটা প'ড়ে দিলেন খুব সম্ভব মৈমনসিংহের কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য। পরের বছর রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় আগমন উপলক্ষে যে-ছন্দোবদ্ধ প্রশস্তিটি আমি রচনা করলাম, সেটি সভায় দাঁড়িয়ে পড়ার

ভার দিলাম সুধীশ ঘটককে — মণীশ ঘটকের ছোটো ভাই সে, আমার নবলব্ধ বন্ধু।

রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম চোখে দেখেছিলাম বুড়িগঙ্গার উপর নোঙর-ফেলা একটি স্টিম-লঞ্চে, যেখানে, নিমন্ত্রণকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রেষারেষি ক'রে, ঢাকার নাগরিকেরা তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। উপরের ডেক্‌-এ ইজি-চেয়ারে ব'সে আছেন তিনি, ঠিক তাঁর ফোটোগ্রাফগুলোর মতোই জোব্বা-পাজামা পরনে — আরো কেউ-কেউ উপস্থিত ও সঞ্চরমাণ, রেলিঙে হেলান দিয়ে আমি দূরে দাঁড়িয়ে আছি! আমার মুখ-চেনা একটি ব্রাহ্ম যুবক আমার কাছে এসে বললেন, 'আপনাকে ইনট্রোডিউস করিয়ে দেবো?' আমি ত্রস্তে ব'লে উঠলাম, 'না, না — সে কী কথা!' একজন সাহিত্য-ঘেঁষা উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে এসে বললেন, 'আমি ব্যস্ত ছিলাম — আগে আসতে পারিনি —' আমি ভাবলাম: এঁর আসা না-আসায় রবীন্দ্রনাথের কি সত্যি কিছু এসে যায়? অসহযোগের কথা উঠলো; রবীন্দ্রনাথের মুখের শুধু একটা কথা আমার মনে আছে — 'নিগেশন অব কালচার।' এলেন হাসি ছিটিয়ে, ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে, অম্লনিম্লান অঙ্গভঙ্গি ও শ্রবণসুভগ সিলেটি টানের উচ্চারণ নিয়ে, ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা অপূর্বকুমার চন্দ — আমার কলেজের অধ্যক্ষ তিনি, রমনার অধ্যাপকমহলে রমণীয়তম মানুষ। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কবিতা-পাঠ আমি প্রথম শুনেছিলাম তাঁরই বাড়িতে

এক রবীন্দ্র-সন্ধ্যায়, সবান্ধবে রবাহূতভাবে উপস্থিত হ'য়ে। অন্য দু-একটা কারণেও তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তাঁরই জন্য সেই ক্ষুদ্র ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের লাইব্রেরিটি আধুনিক য়োরোপীয় সাহিত্যে পরিপুষ্ট ছিলো, আসতো 'লণ্ডন মার্কারি', আমেরিকার 'ডায়াল' পত্রিকা; ছাত্রদের কমন-রুমে সাজানো থাকতো থরে-থরে সচিত্র বিলেতি সাপ্তাহিক, যার একটির পাতায় আমি প্রথম পড়েছিলাম চেস্টার্টনের 'লণ্ডন নোটবুক্' — পত্রিকার ঠিক এক-পৃষ্ঠা-জোড়া এক-একটি মনোমুগ্ধকর প্রবন্ধ বা ছোটোগল্প। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকেও অপূর্বকুমার আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন এক ভল্যুম আন্তন চেখভের পত্রাবলি, আর অল্ডাস হাক্সলির প্রথম উপন্যাস 'ক্রোম ইয়েলো'। আমি ইণ্টার-মিডিয়েট কলেজ থেকে বেরোবার আগেই অপূর্বকুমার ঢাকা ছেড়ে চ'লে গেলেন, কিন্তু পরবর্তী জীবনেও তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছিলো।

## ২৭

আমরা প্রথম যখন পুরানা পল্টনে এলাম তখন এবড়ো-খেবড়ো মাঠের মধ্যে ছড়ানো-ছিটোনো তিনটি মাত্র বাড়ি উঠেছে, আরো দু-একটা নির্মীয়মাণ। সবগুলোই পশ্চিম বাংলার ভাষায় কোঠাবাড়ি—পূর্ববাংলায় বলে দালান—শুধু আমাদেরটাই নয়। উত্তরে অনেকখানি জমি ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ ঘেঁষে লম্বা একটি টিনের ঘর তুলেছেন দিদিমা, ইটের পাঁচিলে

ঘিরে দিয়েছেন। ঘরটি তিন কামরায় বিভক্ত, সামনেরটায় আমি থাকি। মেঝে মাটির, শুধু আমারটায় — প্রথম বর্ষায় মেঝে ফুঁড়ে কেঁচো বেরোবার পরে — দিদিমা সিমেণ্টের প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের পুবে-উত্তরে বনজঙ্গল — অনির্ণেয় গ্রাম — আর দক্ষিণে তাকালে চোখ চ'লে যায় রেল-লাইন পেরিয়ে নবাবপুরের প্রথম কয়েকটা বাড়ি পর্যন্ত — ঝাপসা — দুপুরবেলার রোদ্দুরে যেন কাঁপছে। আমার ঘরের বাইরে তুলসীমঞ্চ, পাতার ফাঁকে নীল চোখ মেলে বর্ষায় অপরাজিতা তাকিয়ে থাকে। শরৎকালে উঠোনে ফোটে স্থলপদ্ম, পায়ের ছোঁওয়ায় লজ্জাবতী কুঁকড়ে যায়, ঘাসের সবুজে লাল কেন্নো জ্বলজ্বল করে। শীতের দিনে শুকনো তুলসীমঞ্জরীর গন্ধ ভাসে হাওয়ায়। চৈত্র মাসে 'বাতাস ছুটে আসে হুদ্দাড়— আমার টেবিলের কাগজপত্র উড়িয়ে নেয়, নিবিয়ে দেয় আমার সন্ধেবেলার কেরোসিন-ল্যাম্প। খোলা মাঠের মধ্যে একলা সেই টিনের ঘরটা জ্যৈষ্ঠের দুপুরে উনুন হ'য়ে ওঠে, আর মাঘের রাত্রে বরফের বাক্স — দিদিমা দেয়ালগুলোতে খবর-কাগজ এঁটে কিঞ্চিৎ শীত ঠেকিয়েছিলেন। ঘরে ব'সে শুনি শুকনো পাতা ঝ'রে পড়ে ঝর্ঝর, কোনো স্তব্ধ রাতে আঁতুড়ের শিশুর গলায় কান্না — বটগাছে কোনো পক্ষীশাবক ডেকে উঠলো। কখনো শুনি সারা দুপুর ছাদ-পেটানো গান — সারেঙ্গি বাজে একটানা, তালে-তালে মুগুর পড়ে ধ্রাম্-ধ্রাম্, সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গেয়ে চলে কুড়ি-পঁচিশটি মুগুর-পেটানো বাচ্চা ছেলে — উব-হাঁটু হ'য়ে ব'সে, সারা গায়ে-মাথায় রোদ্দুর নিয়ে, অক্লান্ত। বর্ষা

নামে বিশাল—আকাশ ছেয়ে, প্রান্তর ছেয়ে, পৃথিবী জুড়ে, ধোঁয়াটে নীল কালো মেঘের ভিড়ে নিবিড়—আমাদের টিনের চালে বৃষ্টি পড়ে যেন হাজার সেতারের ঝিমঝিম বাজনা। বাইরে কাঁচা রাস্তায় কাদা, মাঠে-মাঠে ঘাস আরো লম্বা, সব ফোকর ডোবা হ'য়ে উঠলো, ব্যাঙেদের ফুর্তি অঢেল—কিন্তু টুনুকে সাইকেল ঘাড়ে ক'রে অনেক কষ্টে আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে হয়। কখনো কোনো বৃষ্টি-থেমে-যাওয়া মধ্যরাতে মেঘ চুঁইয়ে ঝ'রে পড়ে জ্যোছনা, মাঠের উপরে রাত্রি হ'য়ে ওঠে নীলাভ, আর সবুজ, আর রহস্যময়। কখনো সারারাত বৃষ্টির পরে সূর্য উঠে আসে উজ্জ্বল, নতুন উৎসাহে দখল ক'রে নেয় জগৎটাকে। আবার কখনো কোনো মেঘলা সকালে হাওয়ায়-হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় গান—কনক দাশের কণ্ঠে—'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে—পিছু ডাকে—' আমার মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সম্মোহন—কোনো সুখ, যা মুখে বলা যায় না, কোনো দুঃখ, যা সুখের চেয়েও ভালো। কখনো কোনো নির্জন পথে চলতে-চলতে আমি কী-যেন ভেবে হেসে উঠি হঠাৎ, বা ঠোঁট নেড়ে-নেড়ে কবিতার লাইন বানাতে থাকি। দিন, রাত্রি, ঋতুর হেরফের—যা-কিছু জীবনে এমনি পাওয়া যায়—মেঘের খেলা, চাঁদের ভাঙা-গড়া, রোদ্দুরের রং-বদল, আর স্বপ্ন, কিছু স্বপ্ন—এই সব নিয়ে পুরানা পল্টনে আমার দিন কেটেছিলো—সেই প্রথম একটা-দুটো বছর, কিন্তু শুধু এ-সব নিয়েই নয়। ততদিনে আমার বাইরের জীবনও পুরস্ত।

রাত হয়েছে, আমি শহর থেকে বাড়ি ফিরছি। অনেক রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে বেড়িয়ে, অনেক হাসি গল্প আড্ডার পরে, চীনেবাদাম চায়ের পেয়ালা গোকুল নাগ আর সেল্মা লাগের-লফ-এর পরে — এখন আমি একলা। চলেছি পায়ে হেঁটে — ঐ একটি দৈহিক ব্যায়ামে আমি ওস্তাদ। আমি সাইকেল চালাতে পারি না — চেষ্টা ক'রেও শিখতে পারিনি — আর ঘোড়ার গাড়ির পিছনে দু-আনা পয়সাও আমার মতে স্রেফ বাজে খরচ। নবাবপুর ধ'রে উত্তরে যত এগোচ্ছি, তত ক'মে আসছে লোকজন, আমি আস্তে হাঁটছি, আমার পা দুটো ক্লান্ত — কিন্তু রেল-লাইনের কাছাকাছি এসে আমি চলার বেগ বাড়িয়ে দিয়েছি, পাছে লেভেল-ক্রসিঙে আটকে যেতে হয়। কিন্তু, যেমন প্রায়ই হ'য়ে থাকে — ঠিক আমারই চোখের সামনে, যেন দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়েই ঘুন্টিওলাটি গেট নামিয়ে দিলো — এখন একটা মালগাড়ি আসার সময়, অন্তত পনেরো মিনিটের ধাক্কা। অগত্যা একটু কসরৎ করতে হয় আমাকে, তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে গ'লে লাইন টপকে বেরিয়ে আসি। এখানেই রমনার আরম্ভ — বলা যায় এক অন্য দেশ।

একটি লোক নেই রাস্তায়। দোকানপাট নেই। বাতাসে নেই ধুলোয় মেশা অশ্বমলের গন্ধ। বাতাস অনেক বেশি স্বাদু, রাত্রি অনেক বেশি গভীর। পুরোনো ঢাকার রাস্তাগুলি সব নির্বৃক্ষ, কিন্তু এখানে গাছ সারি-সারি, প্রতিটি বাড়িতে বাগান।

আমার ডাইনে একটার পর একটা খেলার মাঠ — ঐ দূরে অন্ধকারে মিশে আছে কচিৎ-ব্যবহৃত গবর্মেণ্ট-হাউসের অস্পষ্ট অবয়ব — আর বাঁয়ে আলো-জ্বলা দোতলা ডাকবাংলোটি, যার সীমানা পেরিয়ে বাঁয়ে বেঁকেছে রেল-কলোনির ফিরিঙ্গি-পাড়া। সেটা ছেড়ে দিয়ে আমি এগিয়ে যাই সামনে, সোজা উত্তরে — আর তক্ষুনি আমার পদাতিকবৃত্তির বহুকালের সঙ্গী ছায়াটিকে আমি হারিয়ে ফেলি, যা ল্যাম্পোস্টের আলোয় ছোটো-বড়ো হ'য়ে, সামনে-পিছনে লুকোচুরি খেলে, আমাকে অনেক কৌতুক জুগিয়েছে অনেকদিন। অন্ধকার এখানে — পুরানা পল্টনের পুরো চৌহদ্দি বিদ্যুৎহীন। আমার ডাইনে মাঠ চলেছে এখনো, কিন্তু বাঁয়ে একটা রহস্যময় বন অথবা বাগিচা — ভিতরে কোনো খৃষ্টধর্মীর কবর, ফটকের মাথায় আমার পক্ষে অবোধ্য একটি লিপি উৎকীর্ণ — অক্ষরগুলি খুব সম্ভব গ্রীক। এই বনটুকু পেরোনোমাত্র আমার দু-দিকেই প্রান্তর খুলে যায়, আর অন্ধকারে ভেসে ওঠে একটি আলোর দ্বীপ, সারি-সারি খরোজ্জ্বল জানলা — যেন নৈশ নদীর কালো জলের উপর স্টিমারের সার্চলাইট, স্টিমারের মতোই ধ্বকধ্বক এঞ্জিনের শব্দে জীবন্ত। বিদ্যুৎ-কোম্পানির পাওয়ার-হাউস এটা — সারা রাত আলো জ্বলে এখানে, দিনে-রাত্রে এঞ্জিন থামে না। সেই উজ্জ্বলতা থেকে চোখ ফেরালে আমার সামনে আমি অন্য একটি আলো দেখতে পাই — ক্ষীণ, ম্লান, ঘোলাটে একটি বিন্দু, কিন্তু আমার সেটাকে মনে হয় যেন আমন্ত্রণ, যেন অভ্যর্থনা। লণ্ঠন জ্বলছে পরম-ভবনের বারান্দায়, পুরানা

পল্টনের প্রথম বাড়ি এটি — ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দুই অর্থেই — সে-বাড়ির ছেলে পরিমল আমার বন্ধু।

কিন্তু পরম-ভবনের পাশ দিয়ে গেলে একটু ঘুর হয় ; — আমি নেমে আসি পাকা বাঁধানো শড়ক ছেড়ে মাঠে, পাওয়ার-হাউসের দিকে পিঠ ফিরিয়ে। অন্ধকার অনেক আগেই আমার চোখে স'য়ে গেছে, তারার আলোয় আমি স্পষ্ট দেখতে পাই গাঁয়ের লোকেদের পায়ে-পায়ে তৈরি আঁকাবাঁকা পথ, কিন্তু সেই রেখাটুকু আমার পায়ের পক্ষে বড়ো সংকীর্ণ ; — আমি মাড়িয়ে চলি বুনো ঘাসের জমি, চোরকাঁটার চুলকোনি টের পাই, মাটির ঢেলায় ঠোক্কর খাই কখনো বা। মস্ত গোল মিশকালো আকাশ তারায়-তারায় ফেটে পড়ছে, আমার মাথার উপরে কালপুরুষ, রুপোলি একটি স্রোতের মতো ছায়াপথ আমার চোখের সামনে। আমি চ'লে এসেছি বটগাছ ছাড়িয়ে, ডাইনে দেখছি দিগন্তরেখার আব্রুর মতো গাছপালা-গুলোর ফাঁকে-ফাঁকে একটা তামাটে রঙের ঝিলিমিলি — চাঁদ উঠছে। ঐ আমার টিনের বাড়ির ঝাপসা রেখা, এই পৌঁছলাম। সারা গায়ে ঘুমের গন্ধ নিয়ে দরজা খুলে দেন দিদিমা ; আমার খাবার জালিতে ঢেকে তুলে রেখেছেন তিনি, অতি যত্নে আমার বিছানা পেতে মশারি গুঁজে দিয়েছেন। খোলা হাওয়ায় ঘাসের গন্ধে অতক্ষণ পথ চলার পর আমার মনে হয় ঘরের মধ্যে গুমোট, লণ্ঠনের আলোয় চোখে ধাক্কা দেয় মশারিটা — কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেই চৌখুপিটার মধ্যেই লুকোতে হয় আমাকে, শিয়রের টেবিলে লণ্ঠনটাকে আরো

উশকে দিয়ে। শুয়ে-শুয়ে পড়ি যে-কোনো একটা উপন্যাস, যতক্ষণ না ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে — কখনো-কখনো হঠাৎ বড়ো ব্যর্থ লাগে নিজেকে ; মনে হয় এত প'ড়েও, এত ঘোরাঘুরি মেলামেশা ক'রেও আমি যা চাই তা পাচ্ছি না এখনো, আমার ইচ্ছেগুলো আমার চাইতে বড়ো।

কী ছিলাম আমি সেই সময়ে ? একটা আবেগের পিণ্ড, বাস্তবে-কল্পনায় জট-পাকানো একটা বাণ্ডিল — অগোছালো, অস্থির, দোলায়মান — মনের এক অংশে নেহাৎ ছেলেমানুষ, আর অন্য অংশে অনেক বয়স্কের চেয়েও অধিক বয়স্ক। কাঁপছি আমি সারাক্ষণ, যে-কোনো হাওয়ায়, যে-কোনো ইঙ্গিতে, যেন আমি বড্ড বেশি খুলে যাচ্ছি, যেন আমার ভিতর-মহলে অনেকের জন্য জায়গা থাকলেও আমার নিজেরই কোনো আশ্রয় নেই। আমার শাসনহীন উদ্দেশ্যহীন অনুভূতিগুলো মুচড়ে দেয় আমার স্নায়ুতন্ত্র, আমার বুদ্ধিকেও বিভ্রান্ত করে। আমি বুঝতে পারি না যে মিলিয়ন-কাটতির 'ইফ উইন্টার কাম্‌স' উপন্যাসটা নেহাৎ বাজে, রোমাঞ্চকর মারী করেলি অন্তঃসারহীন — এমনকি রবীন্দ্রনাথ আর সত্যেন্দ্র দত্তের মধ্যে জাতের তফাৎটাও মাঝে-মাঝে মুছে যায় আমার ধারণা থেকে। যা-কিছু আমার মনটাকে নিয়ে যে-কোনোরকম তোলাপড়া করে তা-ই আমার কাছে 'ভালো' — এবং প্রায় একই ভাবে মূল্যবান। আমার বেড়ে-চলা বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে এমন কেউ নেই যে আমার চোখে অসাধারণ নয়, বা অন্তত 'চমৎকার ছেলে' নয় ; আমি

তাদের মধ্যে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে বিলিয়ে দিচ্ছি নিজেকে—হরিলুঠের বাতাসার মতো অজস্র। প্রেমে প'ড়ে আছি যে-কোনো মেয়ের, বছরের মধ্যে যে-কোনো তারিখে—যাকে চিনি অথবা চিনি না, যাকে দেখেছি অথবা দেখিনি, অথবা শুধু নাম শুনেছি হয়তো :—যে-কোনো একটা ছুতো পেলেই আমার নাড়ি চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, মনের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। কিন্তু এত অপব্যয়ের পরেও আমার আবেগ আমি ফুরোতে পারি না ; তা উপচে পড়ে আমার লেখার খাতায়, 'প্রগতি'র পাণ্ডুলিপি-সংখ্যাগুলিতে—পদ্যে গদ্যে অদম্য ও ফেনিল। যেমন ছাপার বইয়ের অক্ষরগুলোর উপর দিয়ে বুনো ঘোড়ার বেগে দৌড়ে চলি আমি, তেমনি আমার কলম চলে চিন্তাহীন ও মসৃণ—শব্দ, মিল, ছন্দ, সবই আমাকে অতি সহজে ধরা দেয়। যতক্ষণ লিখি, মৌজে থাকি ; লেখার পরেও মনটা বেশ খুশি লাগে—কিন্তু কয়েকটা দিন বা দু-একটা মাস যেতে-না-যেতে সেই রং-বেরঙের বেলুনগুলো আমারই চোখের সামনে চুপসে যায়। আর আমার সেই 'মর্মবাণী' ব'লে বইটা—এই সেদিনমাত্র যেটা উপহার দিয়েছিলাম জনে-জনে মুন্সিগঞ্জের সাহিত্যসভায়—সেটা কবে যে শব্দহীন ও নিঃশোকভাবে কবরস্থ হ'য়ে গিয়েছিলো আমি তা টেরও পাইনি—সেটাকে আমি এখন বলি ছেলেমানুষি, কিন্তু আমার টাটকা-গজানো লেখাগুলিও দু-একবার হাত-পা ছুঁড়েই শিটিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই লেখালেখি ব্যাপারটাই কেমন আটকে রেখেছে আমাকে—বাইরের সব টানা-হেঁচড়ার মধ্যেও আমাকে বার-বার সেখানেই

ফিরতে হয়। আমি তাই মানতে পারি না যে আমার এখন থেকেই আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য তৈরি হওয়া উচিত (যে-পরামর্শ আমার গুরুজনদের মধ্যে কেউ-কেউ আমাকে দিয়ে থাকেন মাঝে-মাঝে); —আমার কেবলই মনে হয় আমি একটি ছাড়া অন্য কোনো কাজের যোগ্য নই, এবং সেই একটিকে নিয়েই সারা জীবন আমাকে কাটাতে হবে। আমার সব অস্থিরতার তলায় এই একটি বিশ্বাস নিষ্কম্প্র।

২৮

আমার ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা হ'য়ে গেলো, এখন গ্রীষ্মের ছুটি। ছুটির শুরুতে ঘুরে এসেছি কলকাতায়— এই প্রথম দূর-পথে এস্কর্টহীন, বাংলাদেশের রাজধানীতে এই প্রথম স্বাধীনভাবে পর্যটক। সেখানে আমাকে চুম্বকের মতো টানছিলো দশের-দুই পটুয়াটোলা লেন; সেই অভিযান ব্যর্থ হয়নি, আমি জেনে এসেছি আমি 'কল্লোলে'রই একজন, 'রজনী হ'লো উতলা' নামে আমার একটা গল্প দীনেশ-রঞ্জন গ্রহণ করেছেন। সেটা অচিন্ত্যকুমারের হাতে দিয়ে আমি বলেছিলাম, 'গল্পটা একটু মর্বিড।' অচিন্ত্য হেসে বলেছিলেন, 'আমরা মর্বিড লেখাই পছন্দ করি।' বাজারে তখন 'মর্বিড' কথাটা নতুন উঠেছে।

কলকাতায় আমার দিন কেটেছিলো নিত্য-নতুন উত্তেজনার মধ্যে, কিন্তু দৈবদোষে বাসা পেয়েছিলাম ভবানীপুরের এক ঘিঞ্জি

গলিতে — যেখানে রাত্রে আমাকে ফিরতেই হয়, এক বাসিন্দাবহুল অবরুদ্ধ আবহাওয়ায়। তাছাড়া মহানগরী তখন আমার টিনের চালার চেয়েও উত্তপ্ত ছিলেন, আর 'কল্লোল' আপিশে অনেকের সঙ্গে চেনাশোনা হ'য়ে থাকলেও আমাকে তখন পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে কাছে টেনেছিলেন শুধু অচিন্ত্য। তাই, কলকাতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ সত্ত্বেও, ঢাকায় ফিরে স্বস্তি পেয়েছিলাম সেবার; নতুন ক'রে ভালো লেগেছিলো পুরানা পল্টনের উন্মুক্ত মাঠ, নির্জনতা, আমার অভ্যস্ত আরাম, আমার অবকাশে ভরা অন্তরঙ্গ দিন-রাত্রিগুলি। এই যে আমি বেঁচে আছি বইয়ে এবং বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হ'য়ে, ভালোবাসা দিয়ে এবং পেয়ে, রৌদ্র এবং নক্ষত্রের আলোয় ঘুরে-ঘুরে — কোনো-কোনো মুহূর্তে আমার মনে হয় এই জীবন বড়ো সুন্দর, বড়ো আশ্চর্য, যেন ভেবে পাই না মানুষের মনে কেন থাকে মালিন্য, ঈর্ষা, বিদ্বেষ — যার প্রমাণ পেয়েছিলাম একবার যখন সন্ধ্যার আবছায়ায় দুটি মুখে-রুমাল-বাঁধা যুবক প্রহার করেছিলো আমাকে আর পরিমলকে — ভেবে পাই না কেন কুৎসিত বাসনা-কামনা আমাকেও দংশন করে মাঝে-মাঝে — যে-আমি কবিতায় এত ভাবের কথা লিখছি। আমার এই সব ভাবনা অবশ্য খুবই অস্পষ্ট — অথবা সেগুলি ভাবনাই নয়, অনুভব মাত্র — যার মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা বা পারম্পর্য নেই — কিন্তু এরই তলা থেকে হঠাৎ একদিন দুটো লাইন ভেসে উঠলো —

'যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে
ব'সে আছি আমি।'

ধীরে-ধীরে, অসমমাত্রিক লাইনের পর লাইনে, মিলছুট, চলন একটু ভারি, বেরিয়ে এলো এক যুবকের জবানবন্দি, এক শাপভ্রষ্ট দেবশিশুর আত্মঘোষণা। 'অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত!'—এই শেষ উক্তিটি কাগজে লিখেই আমার অনুভূতি হ'লো — এটা ঠিক, এটা হয়েছে, এটা সত্যি। মানে, এটা বানানো নয়, আওয়াজের কুচকাওয়াজ নয়, নয় রবীন্দ্রনাথে বা সত্যেন্দ্র দত্তে বদহজমজনিত উদ্গার — এখানে আমার কিছু বলার ছিলো, এই প্রথম আমি নিজের গলায় কথা বলতে পারলাম। তথ্যের খাতিরে বলতেই হয় যে এর পরেও আমি অনেক ঠুনকো দ্রব্য বানিয়েছিলাম, সেগুলো নিয়ে বেসাতি করিনি তাও নয়; কিন্তু কয়েক মাস পরেই 'বন্দীর বন্দনা' কবিতাটা লেখা হ'য়ে গেলো। এতদিন শূন্যে ঝুলে থাকার পর আমি পায়ের তলায় মাটি পেলাম এবার—অন্তত একটু দাঁড়াবার মতো জায়গা। আমার বয়স তখন সতেরো পেরিয়ে আঠারো চলছে; আমার ছেলেবেলার এখানেই সমাপ্তি।